বাংলা

যুবকভারতী

একাদশ শ্রেণী

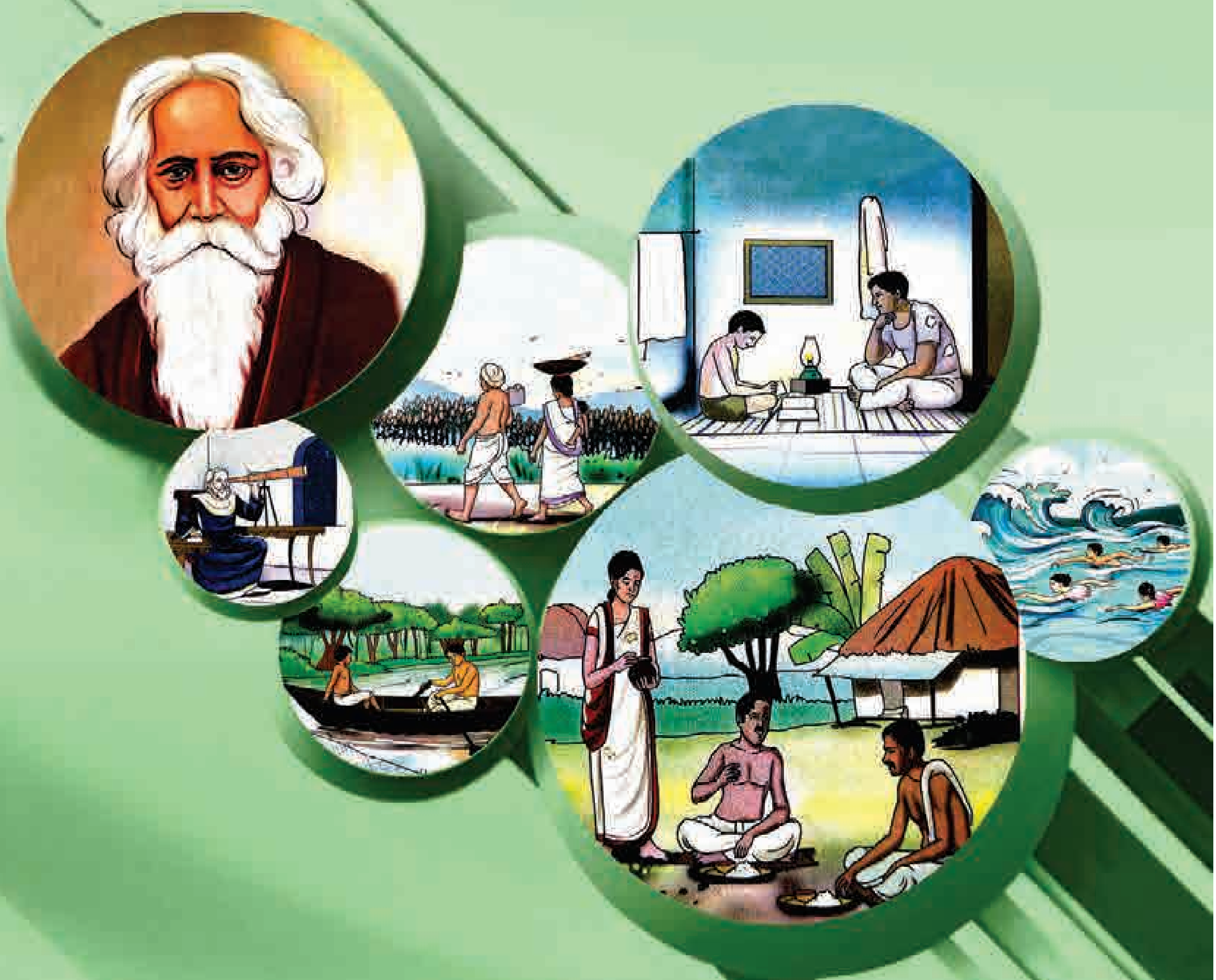

बंगाली युवकभारती इयत्ता अकरावी

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে ;

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে;

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে;

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে;

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে;

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস -২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬)এসডী-4 তারিখ -২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ ২০.০৬.২০১৯ এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে

বাংলা

যুবকভারতী

একাদশ শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে

A4R2V6

আপনার স্মার্টফোনের DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার Q.R CODE এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠের সম্বন্ধে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দৃক শ্রাব্য সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2019
Reprint : 2022

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল,পুণে-৪১১০০৪

এই বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের কাছে থাকবে । এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না ।

বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী মহাদেব শ্যামাপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
শ্রীমতী বন্দনা সেন (সদস্য)
শ্রী রামপদ সরকার (সদস্য)
শ্রীমতী প্রান্তিকা সাহা (সদস্য)
শ্রীমতী বাসন্তী দাসমণ্ডল (সদস্য)
শ্রীমতী শিখারানী বারই (সদস্য)
শ্রী শিবপদ রপ্তান (সদস্য)
শ্রী উত্তম মজুমদার (সদস্য)
শ্রী মাখন মাঝি (সদস্য)
ডা. অলকা পোতদার (সদস্য-সচিব)

বাংলা ভাষা অভ্যাস গট

শ্রী দীপক হালদার
শ্রী অতুল বালা
শ্রী বাবুরাম অমূল্য সেন
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার
শ্রী শঙ্কর মণ্ডল
কু তৃপ্তিলতা বিশ্বাস
শ্রী পরিমল মণ্ডল
শ্রী স্বপন পাল
শ্রী শ্যামল বিশ্বাস
শ্রী অনিল বারই
শ্রী হরেন্দ্রনাথ সিকদার
শ্রী সঞ্জয় মণ্ডল
শ্রী মহীতোষ মণ্ডল
শ্রী নিথিন হালদার
শ্রী অনিমেষ বিশ্বাস
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
শ্রী ভবরঞ্জন ইন্দুভূষণ হালদার
শ্রী অরুন মণ্ডল
শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার

সংযোজক:
ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল,পুণে

সহায়ক সংযোজক:
সৌ.সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী
সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা
পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল,পুণে

নির্মিতি:
শ্রী সাচ্চিতানন্দ আফড়ে
মুখ্য নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র চিন্দরকর
নির্মিতি অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র পান্ডলোস্কর
সহায়ক নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক :
বিবেক উত্তম গোসাবী
নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী
মণ্ডল,প্রভাদেবী,মুম্বাই- ২৫

মুখপৃষ্ঠ : বিবেকানন্দ পাটিল
চিত্রাঙ্কন : যশববন্ত দেশমুখ
রাজেশ লাওড়েকর
মুদ্রণ বিভাগ,পাঠ্যপুস্তক মন্ডল,পুনে
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম.ক্রিমবোভ
মুদ্রণাদেশ :
মুদ্রক:

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা,ভারতের জনগণ,ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক,ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক,সাধারণতন্ত্ররূপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার,মতপ্রকাশ,বিশ্বাস,ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিত করণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে,আজ ১৯৪৯,সালের ২৬ শে নভেম্বর,(তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী ,সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ,বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি ।"

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে,জয় হে,জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারত বাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা,গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

-:প্রস্তাবনা:-

স্নেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

তোমাদের সবাইকে একাদশ শ্রেণিতে আন্তরিক স্বাগত জানাই। তোমাদের জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে বালভারতি, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল, পুণের পক্ষ থেকে প্রথমবার একাদশ শ্রেণির বাংলা 'যুবকভারতী' বই তোমাদের হাতে তুলে ধরেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার মহত্ব অতুলনীয়। যেহেতু অল্পসংখ্যক বাঙালি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ শ্রেণির কৃতিপত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মূল্যায়ন করা হবে। তাই আকলন, উপয়োজন এই দুই কৌশল্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে। এই জন্য পাঠের শেষে কৃতিযুক্ত অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য প্রকার রূপে 'নাটক' এই সাহিত্য প্রকারকে সামান্য পরিচয়ের জন্য ছোট নাটকও এই পাঠ্যপুস্তককে রাখা হয়েছে। যা 'দৃক-শ্রাব্য' সাহিত্য প্রকার রূপে তোমরা অধ্যয়ন করবে ।
পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তোমাদের পাঠের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সুবিধা হবে। আর্থিক দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। রোজগারের সম্ভাবনা নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সূত্র-সঞ্চালন, সংবাদ নির্মিতি, ই-সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ্যক্রমে সমবিষ্ট করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যার ফলে তোমাদের অধ্যয়নের নিয়োজন করতে সুবিধা হবে।ভাষা ও জীবনের সম্বন্ধ অভিন্ন। জীবনের সমস্যা সমাধানের শক্তি ভাষায় আছে। ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে যাতে তোমরা উপয়োজন করতে পারো এই উদ্দেশ্যে 'ভাষা' রূপে বাংলা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দাও।

তোমাদের বিচার শক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য অনেক কৃতী এই পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় কিউ.আর. কোড দেওয়া আছে।
কিউ.আর. কোড দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য তোমাদেরকে মার্গদর্শন করবে।
তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে আদর্শ নাগরিক হও। দেশ উন্নয়নের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করো। তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

(ডা. সুনিল মগর)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে- 04

পুণে
তারিখ : ২০ জুন ২০১৯
ভারতীয় সৌরবর্ষ তারিখ : ৩০ জৈষ্ঠ ১৯৪১

বিষয় : বাংলা

ভাষা বিষয়ক ক্ষমতা একাদশ শ্রেণী

অ.ক্র.	ক্ষেত্র	ক্ষমতা (একাদশ শ্রেণী)	ক্ষমতা (দ্বাদশ শ্রেণী)
১	শ্রবণ	১) সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে নিহিত ভাষা সৌন্দর্য এবং রসবোধ আস্বাদন করে শুনতে এবং শোনাতে হবে।	১) সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে নিহিত আলংকারিক সৌন্দর্য এবং রসবোধ আস্বাদন করে শুনতে এবং শোনাতে হবে।
		২) জনসঞ্চার মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিষয় বস্তু আকলন করে শোনা এবং বিশ্লেষণ করা।	২) বিভিন্ন জনসঞ্চার মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিষয় বস্তু আকলন করে শোনা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করে শোনান।
২	বক্তৃতা ও কথোপকথন	১) বিভিন্ন বিষয়ের সংলাপে সহভাগী হয়ে নির্ভীক ভাবে বিচার প্রকট করা।	১) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সহভাগী হয়ে সেই অনুষ্ঠানের সুত্রসঞ্চালন করা।
		২) আন্তর্জাতিক বিষয়কে জানা এবং সুত্রসঞ্চালন রূপে তাকে প্রস্তুত করা।	২) বিভিন্ন বিষয়ের সংলাপের সহভাগী হয়ে নির্ভীক রূপে আলোচনা করা।
		৩) প্রসঙ্গানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য জয়ঘোষ (উদঘোষণা) তৈরী করে প্রস্তুত করা।	৩) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমকালীন বিষয়কে বেছে নিয়ে তার পরে সমষ্টিগত আলোচনার আয়োজন করা।
৩	পঠন	১) বিভিন্ন সাহিত্যকে ভাব -ভঙ্গিমার সাথে পাঠ করা।	১) কার্যকর ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের জন্য মহাপুরুষদের বাণী এবং সাহিত্যিকদের রচনা অধ্যয়ন করা।
		২) ই-সাহিত্য নিয়মিত পঠন করে আলোচনা করা।	২) বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনী/আত্মকথা অধ্যায়ন করা।
		৩) দেশ-বিদেশে উল্লেখিত সাহিত্য অধ্যয়ন করা এবং তার বিষয়ে জানা।	১) সংগণক (কম্পিউটার) এ ব্যবহৃত লিপি সম্পর্কে তথ্য সংগহ করে তার ব্যবহার করা।
৪	লেখন	১) ভাষা শুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রেখে উচিত বিরামচিহ্নের শুদ্ধ লেখন করা এবং মুদ্রিত বিষয়বস্তু সংশোধন করা।	২) ফিচার লেখন এবং বৃত্তান্ত লেখনের অধ্যয়ন লেখন কার্য করা।
		২) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সম্পুর্ন নিয়োজন করে তাকে পরিবেশন করার জন্য আবশ্যক লেখন করা।	২) ফিচার লেখন এবং বৃত্তান্ত লেখনের অধ্যয়ন লেখন কার্য করা।
		৩) বিভিন্ন সাহিত্য থেকে বেছে নেওয়া পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদান করা।	৩) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য আবশ্যক লেখন করা।

অ.ক্র.	ক্ষেত্র	ক্ষমতা (একাদশ শ্রেণী)	ক্ষমতা (দ্বাদশ শ্রেণী)
৫	ভাষা - অধ্যয়ন	১) রসবোধ, বাৎসল্য, বীর, করুন, হাস্য, ভয়ানক ।	১) রস, শৃঙ্গার, শান্ত, বীভৎস, বীর, অদ্ভুত ।
		২) অলংকার (শব্দালঙ্কার) ।	২) অলংকার (অর্থালঙ্কার) ।
		৩) বাক্য শুদ্ধিকরণ, কালপরিবর্তন, বাগধারা, (পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ এবং শব্দ ভান্ডারের সমাবেশ) ।	৩) বাক্য শুদ্ধিকরণ, কালপরিবর্তন, বাগধারা ।
৬	অধ্যয়ন কৌশল্য	১) নিজের লেখন কার্যে আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা । আন্তরজাল (ইন্টারনেট) কিউ. আর. কোড. , বিভিন্ন চ্যানেল দেখে উপযোগ করা ।	১) সাক্ষাৎকারের নমুনা তৈরী করা এবং সাক্ষাৎকার কর্তার গুন আত্মসাৎ করা ।
		২) পারিভাষিক শব্দাবলী :- কম্পিউটার, বিজ্ঞান, বানিজ্য, কানুন ইত্যাদির সহিত সংলগ্ন শব্দাবলী জানা বোঝা এবং ব্যবহার করা ।	২) স্পর্ধা পরীক্ষার জন্য আবশ্যক নিয়োজন করা।
		৩) বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়ন করে অনুবাদ এবং দ্বিভাষিকের কার্যগুলি জানা ।	৩) বাংলা ভাষা এবং রোজগারের সম্ভাবনাকে বুঝে নিয়ে আবশ্যক ভাষা কৌশল্যকে অবগত করা । ইন্টারনেট, কিউ.আর.কোড বিভিন্ন চ্যানেল দেখে উপয়োগ করা ।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে------

সম্মানীয় শিক্ষক/অভিভাবক বৃন্দ!

আপনাদের জানাতে আনন্দবোধ করছি যে বালভারতী মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ডল,পুনের পক্ষ থেকে প্রথম বার একাদশ শ্রেণির 'বাংলা যুবকভারতী' বইটি আপনাদের হাতে তুলে ধরেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুর্য্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে অতি পরিচিত ও প্রচলিত লেখক-লেখিকার রচনা স্থান পেয়েছে। এ রকম একটি বই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত ও পরিচিত করা। আমরা মনে করি যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠন বিদ্যালয় শিক্ষা ও স্নাতক স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। সুতরাং এই স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যের বিষয়গত আঙ্গিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা থাকা উচিত।

সমিতির চিন্তাভাবনাকে লক্ষ্য করে বইটিকে মোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম বিভাগে মোট ছয়টি গদ্য ও ছয়টি পদ্য রয়েছে প্রতিটি গদ্য পদ্য একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতা, অভিরুচি ও উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে। সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পরীক্ষা বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়; সাহিত্য পাঠের মাধ্যে যে আনন্দ আছে, একটি কবিতা বা গল্পের মধ্যে যে ভালোলাগবার রসদগুলি রয়েছে উহা আত্মসাৎ করাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। শিক্ষার্থীরা যদি একটি গল্প বা কবিতা বা প্রবন্ধ ভালো করে পড়ে উপলব্ধি করতে পারে ও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে তাহলে যে কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে না। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ বিশেষ সাহিত্যে রয়েছে 'গুরু' নামক রূপক নাটক । এই বিশেষ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো নাটকটির রসাস্বাদন করা এবং রচয়িতার রচনা কৌশলকে অধ্যয়ন করা। তৃতীয় বিভাগে রয়েছে 'উপয়োজিত লেখন'। এই বিভাগে মোট চারটি প্রবন্ধ রয়েছে- যার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে বাংলা সাহিত্যের ব্যবহার ও রোজগারের বিভিন্ন সুযোগ অনুসন্ধান করা। এই নতুন পাঠ্যক্রমের প্রতি পাঠের প্রারম্ভে কবি/ লেখক/ লেখিকা পরিচিতি, পাঠ/ কবিতার মূল কথা এবং পাঠের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে আকর্ষণীয় ছবি ও দেওয়া হয়েছে। ছবি দেখে এবং মূল কথা পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা কবিতা বা পাঠটিকে অনায়াসে আকলন করতে পারবে। পাঠের শেষে রয়েছে শব্দার্থ এবং কৃতি যুক্ত অনুশীলনী। প্রতি অনুশীলনীতে আকলন, শব্দসম্পদ, অভিব্যক্তি লঘুত্তরী প্রশ্ন, সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান,ব্যাকরণ, ইত্যাদি সমাবিষ্ট করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের আরম্ভে কিউ.আর.কোড দেওয়া আছে যার মাধ্যমে বইটির সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। পাঠ্যপুস্তকটিকে DIKSHA APP আপলোড করা হয়েছে।সেখান থেকে বইটি ডাউনলোড করা যাবে।

এই নুতন পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য সেটাই- ছাত্র-ছাত্রীরা যা পড়েছে তা ভালো করে জানুক,বুঝুক ও শিখুক আর তখন সে নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো সেই কাজে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা, সঠিক পথ দেখোানো, যাতে ভবিষ্যতে তার কোন অসুবিধা না হয় । তার চিন্তা-ভাবনা ও লেখার মধ্যে স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। শিক্ষক /অভিভাবক শিক্ষার্থীকে সঠিক পথটা দেখিয়ে দেবেন, আপনাদের জ্ঞান ও অনুভবের আলোয় শিক্ষার্থীর চলার পথের অন্ধকার দূর করবেন- আর সেই পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবে আমাদের সন্তানসম শিক্ষার্থীরা তাদের যাত্রাপথ মসৃণ হোক, তারা এগিয়ে চলুক দৃঢ় পদক্ষেপে; আর শিক্ষক-শিক্ষিকারা হোক তাদের আলোর পথের দিশারী। উভয়পক্ষকেই জানাই সমিতির পক্ষ থেকে আগাম শুভেচ্ছা। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে যে সমস্ত লেখক-লেখিকার রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি মুদ্রণের জন্য অনুমতি দিয়ে তারা আমাদের বাধিত করেছেন। সমিতির পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই পাঠ্যপুস্তকটি সমীক্ষণ করে- করে তুলেছে সুন্দর ও আকর্ষণীয় তাদেরকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

****

-: সূচীপত্র :-

অ. ক্র.	পাঠের নাম		সাহিত্য প্রকার	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা ক্রমাঙ্ক
১	আঠারো বছর বয়স	পদ্য	উদ্দীপন মূলক	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১
২	সীতার বনবাস	গদ্য	পৌরাণিক	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৫
৩	দ্বীপান্তরের বন্দিনী	পদ্য	স্বদেশপ্রীতি	কাজী নজরুল ইসলাম	১০
৪	নৈশ অভিযান	গদ্য	উপন্যাস অংশ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪
৫	নুন	পদ্য	সমাজচিত্র	জয় গোস্বামী	২০
৬	ডাকাতের মা	গদ্য	সমাজচিত্র	সতীনাথ ভাদুড়ী	২৩
৭	পাঁওদল	পদ্য	সমানতা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩২
৮	বাঙলা সাহিত্য ও ছাত্র সমাজ	গদ্য	সাহিত্য চর্চা	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৩৫
৯	নীলধ্বজের প্রতি জনা	পদ্য	কাব্যখন্ড	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৪০

-: সূচীপত্র :-

অ. ক্র.	পাঠের নাম		সাহিত্য প্রকার	লেখক / লেখিকা	পৃষ্ঠা ক্রমাঙ্ক
১০	গালিলিও	গদ্য	জীবনী	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	৪৬
১১	তালাক	গদ্য	পারিবারিক	মহাশ্বেতা দেবী	৫৩
১২	আগামী পৃথিবীর জন্য	পদ্য	সচেতনতা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮

বিশেষ সাহিত্য

১	গুরু		রূপক নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪

ব্যবহারিক লেখন

১	সুত্র সঞ্চালন		সংবাদ	ইন্দ্রায়ণী দাসগুপ্তা	৯৬
২	বাংলা ই-সাহিত্য- একটি দৃষ্টি		আলেখ	শ্রী অমর শিকদার	১০০
৩	বাঙলা ভাষাও কর্মসংস্থান		লেখ	আনন্দ বর্ধন	১০৬
৪	সমাচার লেখন		সংবাদ	শশী মুরলীধর নিঘোজকর	১১২

১.আঠারো বছর বয়স

- সুকান্ত ভট্টাচার্য

কবি পরিচিতি - কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের ৪২ নং মহিম হালদার স্ট্রীটে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০ শে শ্রাবণ জন্মেছিলেন। পিতা নিবারন চন্দ্র ভট্টাচার্য ও মা সুনীতি দেবী। সুকান্তের জ্যাঠামশাই ছিলেন সংস্কৃতের পন্ডিত। বাড়িতে ছিল সংস্কৃত পঠন-পাঠনের আবহাওয়া। পরে এই প্রাচীন পন্থার পাশাপাশি উঠতি বয়সীদের আধুনিক চিন্তাভাবনার একটা পরিমন্ডল গড়ে ওঠে । সুকান্ত ছেলে-বেলায় মার মুখে শুনেছেন কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ন। বাড়িতে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের নিত্য অভাব-অনটন । বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত হাহাকার তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই বিশেষ সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তার কবিপ্রতিভা ধীরে-ধীরে উন্মেষিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' (আষাঢ় ১৩৫৪)। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে ২৯ শে বৈশাখ কবির জীবনাবসান হয়। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন -'আমাদের মধ্যে জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে মুখর করে তোলার তপস্যায় সুকান্ত তার বাঙ্ময় জীবনকে আহুতি দিয়েছেন।'

-:কবিতার মূল কথা:-

আঠারো বছর বয়স কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ। নবতারুন্যের ভীরুতাকে পরোয়া না করে আঠারোর তরুণেরা অহরহ দুরূহ কাজে দুঃসাহসিকতা দেখায়, স্পর্ধা প্রকাশ করে। আঠারোর তরুনেরা অবিরাম নানা বাধা ও আঘাতের মুখোমুখি হয়েও বাধাকে জয় করার চেষ্টা করে।

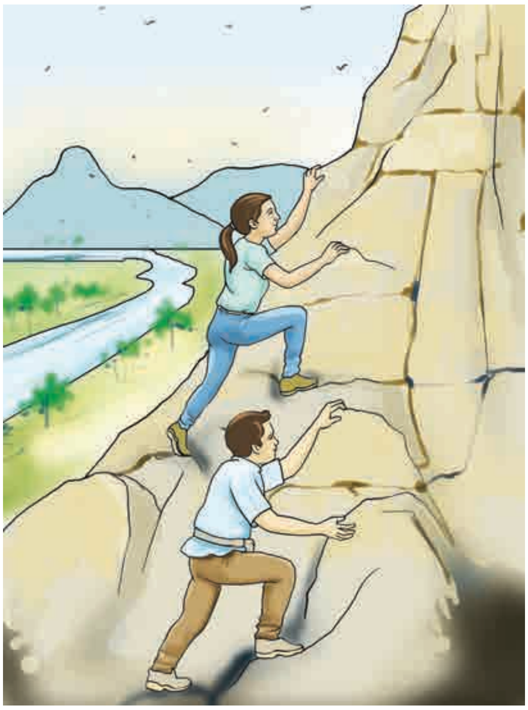

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় উঁকি ।

আঠারো বছর বয়সে নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা ।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া -নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে ।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রনা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রনা ।
আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে জড়ো ,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরো থরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয় -
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।।

****

-: শব্দার্থ :-

দুঃসহ	=	অসহ্য	অহরহ	=	অনবরত	অবিশ্রান্ত	=	অবিরাম
কাঁদা	=	কান্না	পুণ্য	=	পবিত্র	প্রান্তরে	=	খোলা মাঠে
ভয়ংকর	=	ভয়াবহ	সহস্র	=	হাজার	দুর্যোগ	=	বিপর্যয়

অনুশীলনী

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কৃতিকার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :-

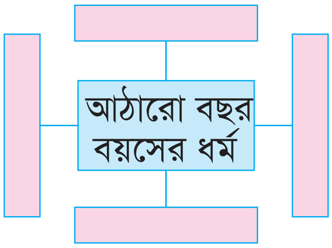

আ) কারণ লেখ :-

১) এ বয়স পথ চলতে থেমে যায় না, তার কারণ -........

২) প্রান দেওয়া-নেওয়ার ঝুলিটা শূন্য না থাকার কারণ -.........

৩) আঠারো বছর বয়স দুঃসহ হওয়ার কারণ - ....

কাব্যসৌন্দর্য

২) (অ) আঠারো বছর বয়স কোনো বাধা-বিঘ্ন মানতে চায় না' - তাহা যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সে পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ।

(আ) আঠারো বছর বয়স কীসের পুণ্য জানে ?

(১) রক্তদানের পুণ্য

(২) ধনদানের পুণ্য

(৩) অন্নদানের পুণ্য

অভিব্যক্তি

৩) (অ) 'তরুনেরাই দেশের ভবিষ্যৎ - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

(আ) 'সমাজে বিপ্লব আনে যুবকরাই' - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

রসাস্বাদন

৪) 'কবি এদেশের বুকে আঠারোকে আহ্বান করেছেন' -

তাহা কোন পঙক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

অ) প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বাক্যগুলির বিশ্লেষণ করো :-

(১) এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য।

(২) আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার।

আ) সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ ।

ব্যাকরণ

অলংকার

যে গুণ দ্বারা ভাষার শক্তি বর্ধন বা সৌন্দর্য সম্পাদন হয়, তাহাকে অলংকার বলে।
ভাষার অলংকার দুই প্রকারের

১) শব্দগত বা ধ্বনিগত অলংকার- শব্দালঙ্কার

২) অর্থ-গত বা ভাব-গত অলংকার অর্থালংকার

১ শব্দালঙ্কার

এই অলংকারের অবস্থানে, এক বা একাধিক ধ্বনির সহায়তায় বাক্য শ্রুতিসুখকর হয় এবং উহার দ্বারা ভাব-দ্যোতনা বিষয়ে কোনো উক্তিকে, সাধারণ উক্তি অপেক্ষা একটু বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে দেয়। শব্দালঙ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিত অলংকারগুলি প্রসিদ্ধ ।

ক) অনুপ্রাস : একই বা একাধিক ব্যঞ্জন - ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বা বারংবার প্রয়োগকে "অনুপ্রাস" কহে ।

যথা - "জোর যার,মুলুক তার" "কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভী।"

খ) শ্লেষালঙ্কার: একটি শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে শ্লেষালঙ্কার হয়।

যথা- "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?"

গ) যমক:- বাক্য বা কবিতার শ্লোক - মধ্যে, একই শব্দের বিভিন্নার্থে পুনরাবৃত্তি হইলে অথবা এক-রূপ বিশিষ্ট কিন্তু বিভিন্নার্থক দুইটি শব্দের অবস্থান হইলে, "যমক" অলংকার হয়।

যথা - " যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে।"

" গিরিশ-করে গিরীশ করে কন্যাদান।"

****

২. সীতার বনবাস

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক পরিচিতি :- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ,সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। তার প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তার। তিনি প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করেন। তাকে যুক্তিবহ ও অপরবোধ্য করে তোলেন। তাকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রচনা করেছেন জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ, একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃতে ব্যাকরণ গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর অনেক শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। যেমন -শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। ২৯শে জুলাই ১৮৯১ সালে কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

-:পাঠের মূলকথা:-

রামচন্দ্রের কথামত লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসের ব্যবস্থা করলেও রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দুজনেই শোকানলে জ্বলছিল । পরে লক্ষ্মণ নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার অশেষ চেষ্টা করেছে। এদিকে সীতাদেবী বাল্মীকিমুনির আশ্রমে দুটি যমজ সন্তান প্রসব করার পর চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল কারণ সেই সময়ে রামচন্দ্র আশ্রমে ছিল না । তবে আশ্রমের মুনিকন্যারা সীতাদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল খুব শীঘ্রই রামচন্দ্র তাকে গ্রহণ করবে।

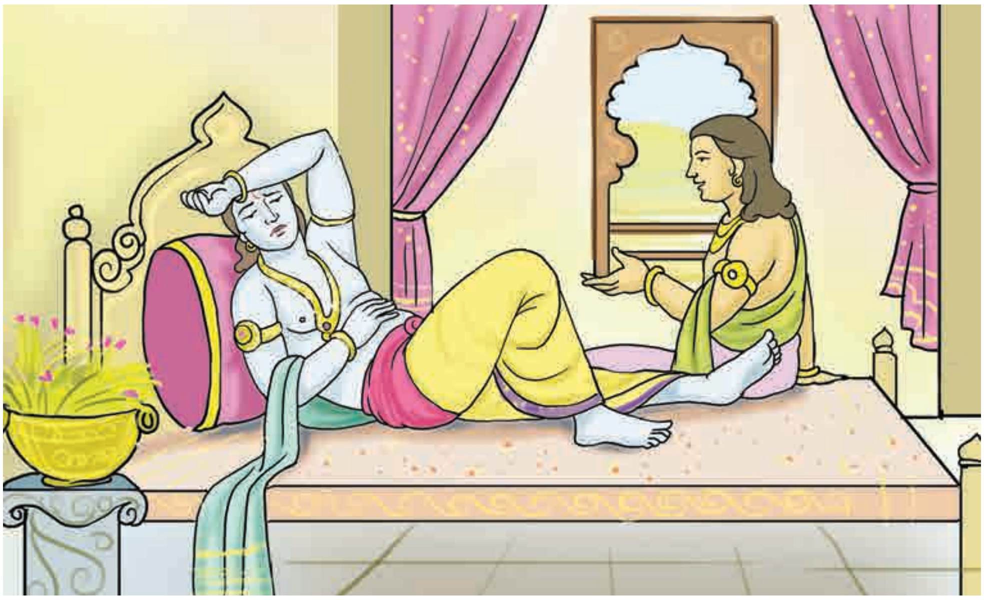

সীতাকে বনবাস দিয়া রাম যার পর নাই অধৈর্য ও শোকাভিভূত হইলেন এবং আহার, বিহার, রাজকার্য-পর্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার একবারে বিসর্জন দিয়া, একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রানা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন; এবং পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে,সর্বাপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালো বাসিতেন। রাম,কেবল লোকবিরাগ সংগ্রহের ভয়ে,সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; সুতরাং, সীতা নির্বাসন শোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলাম; কেনই আমি নিতান্ত নৃশংস হইয়া সীতারে বনবাস দিলাম; কেনই আমি নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভার বিসর্জন দিয়া সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম; ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া তাহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই অর্ধাবশিষ্ট হইল। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে,লক্ষ্মণ,নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের বাস ভবনে গমন করিয়া,কৃতাঞ্জলি পুটে তাহার সম্মুখ দেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গল দশ্রুলোচনে,গদগদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল।

রাম, অবলোকন ও আকর্ণন মাত্র, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও,বহু যত্নে, তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন তিনি, কিয়ৎক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষনের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া,হাহাকার ও অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্বক, ভাই লক্ষণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে; আমি তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? আর যে যাতনা সহ্য হয় না;এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

উভয়েই, অধৈর্য হইয়া, কিয়ৎক্ষন বাষ্প বিসর্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে, স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম কিঞ্চিৎ শান্তচিও হইয়া লক্ষ্মণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।নয়নজলে বক্ষস্থল ভরিয়া গেল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাকশক্তিরহিত হইয়া রহিলেন; এবং পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, এবং তাহার তাদৃশ দশা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না।

শোকাপনোদনের কোনো উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক।

তিনি এইরুপ আলোচনা করিয়া বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য ! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ মহানুভবের পক্ষে কদাচ উচিত নহে । আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। আপনি সকলের হিতানুশাসন কার্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে।প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ্য মহানুভব একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করুন। ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক,আপনি যতদিন শোকাভিভূত থাকি - বেন, রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্ম প্রতিপালন হয় না । অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য অবলম্বন করুন; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনো ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, সস্নেহ সম্ভাষণপূর্বক বলিলেন,বৎস ! তোমার উপদেশ বাক্য শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল । তুমি যথার্থ বলিয়াছ,আমি যে উদ্দেশ্যে জানকীরে বনবাস দিয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জন্য শোকাকুল হইলে তাহা বিফল হইয়া যায়। অতএব, এই মুহূর্ত অবধি আমি শোকসংবরণে যত্নবান হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে, কোনো ক্রমে, আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বলো, কল্য অবধি রীতিমত রাজকার্য পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; তাহারা যেন যথাকালে সমস্ত আয়োজন করিয়া কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎক্ষন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর,অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কী বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ। লোকে কী সুখভোগলোভে রাজ্যাধিকারলাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমায় এ জন্মের মতো সকল সুখ জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাসে দিলাম। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে, আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা ও ভদ্রতা বিসর্জন দিতে হইল।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন; এবং ধৈর্যাবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণপূর্বক, পরদিন প্রভাত অবধি, যথানিয়মে রাজকার্য পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে, তিনি রাজকার্যপর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে; এবং লোকেও, বাহ্য আকার দর্শনে,বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড়ো ধৈর্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন । কিন্তু, তাহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, তাহাকে সতত মর্মবেদনাপ্রদান করিতে লাগিল। যৎকালে, তিনি নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্তিমান ধর্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজাকার্যপর্যালোচনা করিতেন, তখন তাহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাহার তুল্য ধৈর্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য হইতে অবসৃত হইয়া, বিশ্রামভবনে প্রবেশকরিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণের সান্ত্বনা বাক্যে, তাহার শোকানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত।

ফলত,তিনি কেবল হাহাকার,বাষ্পমোচন,আত্ম ভর্ৎসনা,ওসীতার গুণকীর্তন করিয়া,বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন।এইরূপে দুর্নিবার সীতা বিবাসন শোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্বল ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন; বস্তুত রাজকার্য ব্যতীত, আর কোনো বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না। এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে, জানকী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি, যথাবিধানে জাতকর্ম প্রভৃতিক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনি তনয়ারা,সীতার সন্তান প্রসব দর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান আনন্দে কোলাহল হইতে লাগিল। সীতা দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে, মুনিতনয়ারা উল্লসিত মনে প্রীতিপূর্ণবচনে বলিলেন, জানকী! আজ বড়ো আনন্দের দিন; সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকভরে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকী! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন?

বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এজন্য তিনি কিয়ৎক্ষণ কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ! তোমরা কি কিছুই জান না যে, আমি এমন আনন্দের সময় কী জন্য শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? পুত্রপ্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু কেমন অবস্থায়, আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে এ জন্মের মতো, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্তে আমি জাহ্নবী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; অথবা, অন্য কোনো প্রকারে, আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়। এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী অনিবার্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।মুনিকন্যারা, সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়সখী! শোকাবেগের সংবরণ করো, যাহা যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে, কিন্তু, অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না।রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তিনি, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া, ঈদৃশ অদৃষ্টচয় অশ্রুতপূর্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন । আমরা পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে, অতএব শোকসংবরণ করো। মুনিতনায়া দিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, সীতার নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পরারি বিগলিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে মুনিতনয়া দিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তাঁহরাও শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সদ্যপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনীশক্তি যে,তাহাদের ক্রন্দন শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ।

****

-: শব্দার্থ :-

নিরন্তর = সর্বদা, অবধি = পর্যন্ত, নৃশংস =নিষ্ঠুর, নির্বাসিত = দেশ হইতে বহিষ্করন,

অনুশীলনী

আকলন

১) লেখ:

(অ) রামচন্দ্র যে ভাবে একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ....

(আ) কারণ লেখ :

(১) রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না ....

(২) সীতা শ্রবনমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ....

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও :

(১) রামচন্দ্র (২) সীতা (৩) লক্ষ্মণ

শব্দ সম্পদ

(২) (অ) নিম্ন শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

বৃদ্ধি,সংযোগ,হর্ষ,স্থির,জীবন,প্রিয়,ন্যায়, চৈতন্য

(আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :

নিযুক্ত,উৎক্ষিপ্ত,অভিরুচি,প্রযত্ন,উৎফুল্ল,ছোট

(ই) নিম্নলিখত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-

উৎসাহ,বিসর্জন,উল্লাস,অবসর,দুঃখ,উপেক্ষা,আনন্দ,দর্শন,মন,যোগ,সময়,বস্ত

অভিব্যক্তি

(৩) (অ) ‘ বড় ভাই পিতার সমতুল্য - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

(আ) মাতৃস্নেহ অতুলনীয়’ এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

পাঠের উপর আধারিত লঘুত্তরী প্রশ্ন

(৪) (অ) রামচন্দ্র মুর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন কেন ?

(আ) জানকী অনিবার্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন কেন ?

(ই) পুত্র প্রসবের পরেও সীতা কেন আনন্দিত হয়নি?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ) (১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য চর্চার পরিচয় দাও ।

(২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবনের এবং কর্মজীবনের পরিচয় দাও ।

(আ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত চারটি গ্রন্থের নাম লেখ ।

****

৩. দ্বীপান্তরের বন্দিনী

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম:- জন্ম ২৫ শে মে ১৮৯৯, চুরুলিয়ায়। মৃত্যু ২৯ শে আগস্ট ১৯৭৬। শৈশবে পিতৃহীন নজরুলকে জীবনে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। পরাধীন দেশের নাগরিক নজরুলকে আখ্যা দেওয়া হয় 'বিদ্রোহী কবি'। তাঁর কাব্য ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে প্রতিবাদের হাতিয়ার।এছাড়াও তাঁর বাংলা গজলগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। গীত রচয়িতা, গায়ক ও সুরকার হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। এক সময় যেমন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে রচনার মাধ্যমে স্বদেশিকতা প্রচারের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে পক্ষাঘাতে তিনি বোধশক্তিহীন হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে তাঁর জীবনাবসান হয় । তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 'অগ্নিবীণা','দোলন চাঁপা' 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি। এই কবিতাটি 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

-:কবিতার মূল কথা:-

ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারে দেশবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্বিচারে দীপান্তরে নির্বাসন স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে অনেকাংশেই রুদ্ধ করে দিয়েছিল সেই সময়। আন্দামান হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষনের ভয়াবহতার প্রতীক।

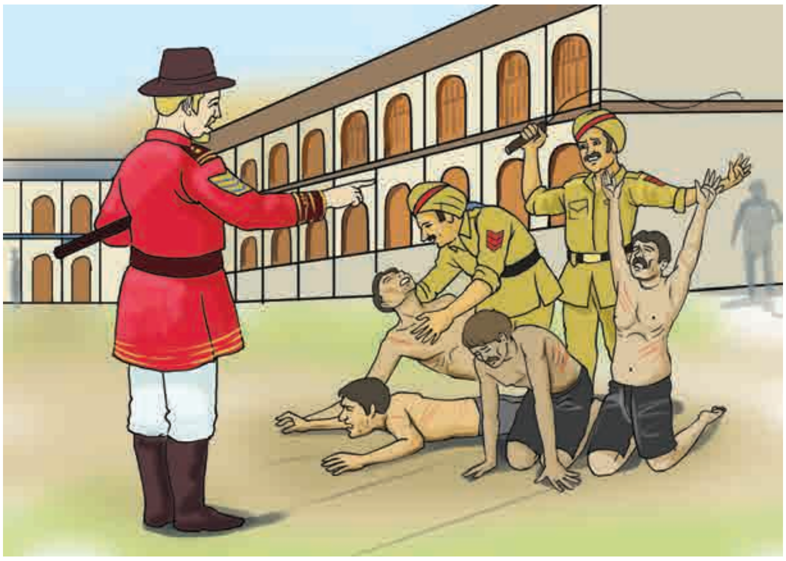

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী ?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর ?
পুণ্যবেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন - 'দেড় শত বছর ।'-------
সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?

মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?

তবে এ কিসের আর্ত আরতি,
কিসের তবে এ শঙ্খারাব?...
সাত সমুদ্র তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি ?
হায় শৌখীন পূজারী,বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছে ফুঁ,
পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু !
পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত-শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী
পুজারী সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী - পূজা -উপচার বহি?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কাল বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ ?
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ ?
তবে তাই হোক!ঢাক' অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ !
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক ।

-: শব্দার্থ :-

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপে নির্বাসন	সান্ত্রী	প্রহরী
শতদল	পদ্মফুল	সীসা	ধাতু বিশেষ
রক্ষপুর	রাক্ষসদের আবাসস্থল	পিঞ্জরে	খাঁচায়
চেড়ী	অন্তঃপুরের নারী প্রহরী	সপ্তসিন্ধু	সাত সমুদ্র
রক্তসোঁদাল	রক্তেভেজা	শুচি	পবিত্র
বেদী	যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত উঁচু জায়গা	আখ্যা	উপাধি

অনুশীলনী

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :

(অ) ছক পূর্ণ করো :-

বেতার-সেতারে এ বার্তা এসেছে কি ?

ই) কারণ লেখ:-

(১) দেশ মা'কে দ্বীপান্তরিতা বলার কারণ - ....

(২) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে বন্দি করে রাখার কারণ -..........

(৩) 'ভারত-ভারতী' বলতে কবি সরস্বতীকে বুঝিয়েছেন তার কারণ - ....

কাব্যসৌন্দর্য

২) অ) ধর্মীয় যাজকদের উদ্দেশ্য যে নিছক লোক-দেখানো ছিল, তাহা যে পঙক্তির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সে পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ।

আ) 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতায় কবির কণ্ঠে কোন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ?
(১) দেশমাতার জয়ের ধ্বনি।
(২) সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি।
(৩)দেবী সরস্বতীর ধ্বনি।

অভিব্যক্তি

৩) অ) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তোমার মনোভাব ব্যক্ত করো।

আ) প্রতিটি মানুষই স্বদেশপ্রেমী হওয়া উচিত - এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

রসাস্বাদন

৪) 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় কোন পঙক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

অ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লেখ।

১) পুণ্যবেদীর শূন্যে ধ্বনি
ক্রন্দন - 'দেড় শত বছর।'......

২) যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,

আ) কাজী নজরুল ইসলামের লেখা দুটি কাব্য গ্রন্থের নাম লেখ।

৪.নৈশ অভিযান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি:- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৬ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে হয় । তিনি ছিলেন একজন বাঙালি লেখক,ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় এবং বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক । তার পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তার লেখা উপন্যাস বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, পল্লী-সমাজ, দেনা-পাওনা, 'পথের দাবী' ইত্যাদি। গল্পের মধ্যে 'রামের সুমতি' 'মেজদিদি' 'আঁধারে আলো' প্রভৃতি। ১৬ ই জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। 'নৈশ অভিযান' প্রবন্ধ টি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস থেকে সংকলিত।

-:পাঠের মূলকথা:-

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্র রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে নৈশ অভিযানে বেরিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল মাছ চুরি করা। এই অভিযানে শ্রীকান্ত খুবই ভয় পাচ্ছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ইন্দ্র তাঁকে ভয় মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। ঘটনাক্রমে শ্রীকান্ত সাহসের পরিচয় দিলে ইন্দ্র খুব খুশি হয়েছিল। কিছু মাছ তারা নৌকায় তুলেছিল। পরে জেলেদের ভয়ে তারা সোজা বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল । রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোর বয়স্ক দুটি বালক । প্রকৃতি দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে ,কিন্তু সেকথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই!বায়ু লেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ,নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্তি। নিবিড় কালোচুলে দ্যুলোক ও ভূলোক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্ররেখার ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকুলগতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে , কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে । আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোনখানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না । এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কহিল, কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে ? আমি বলিলাম, নাঃ -

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই-সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না - জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না । সেও আর কোন কথা কহিল না । বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—"অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহু দুরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান । যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙ্গাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমনি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই , বিচ্ছেদ নাই ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে-মাঝে এক- একবার ঝুপঝাপ শব্দ । জিজ্ঞাসা করিলাম ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায় ? সে নৌকার মুখটা আর একটু, সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত । ওঃ তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না । একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি সুদ্ধ আমরা সব গুড়িয়ে যাব । তুই দাঁড় টানতে পারিস ? পারি । তবে টান্ । আমি টানিতে শুরু করিলাম । ইন্দ্র কহিল, উই-উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া । ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে - জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাকে পুঁতে দেবে । এ আবার কি কথা ! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে ! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই । এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না— আমরা যাব কি ক'রে ? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবেনা।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেইভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল —তবে এলি কেন? চল তোকে ফিরে রেখে আসি -কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনেরোয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই- ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু ,হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্ , শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই - ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে ব'লে —আর পালাবার জো নেই,তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল।এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই। তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূর।ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দুর ? ছ - সাত ক্রোশও হবে না বোধ হয় । হাত ভেরে গেলে চিত হয়ে থাকলেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি। আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল,তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসংকুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে

আর এদিকের তীরে উঠিবার জো নাই । দশ-পনেরো হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে –এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সংকুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে ?

ইন্দ্র কহিল,সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম । তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল – আমি নয় । তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়–একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে –মিটমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল । ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহনার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম । জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে ।আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল ।

ধীবর প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই । ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙ্গাইয়া রাখে।পরে বর্ষার জলস্রোতে- বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনেরো, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎসরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙি খানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই ? কাজ আছে । আর না পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম,কি? কি হল? ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে–চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে–ঐ দ্যাখ !

তাই ত বটে! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই।এই ভুট্টাক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে,তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল ।এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয়দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে,এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময় তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা ও জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল একবুক কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে-বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইদ্র ? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল আমি নীচে। নীচে কেন? ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে ? ও গঙ্গায় । খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব। শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । অকস্মাৎ কিছুদুরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে ব'সে বুনো শুয়োর তাড়াচ্চে। বুনো শুয়োর ! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়া ছিলাম।এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়োরের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক-কাদা-ও- জলের- মধ্যে- এই বনের ভিতরে । এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনেরো এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া "ছপাৎ" করিয়া শব্দ হইতেছে ।একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়োর না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত ? ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু,না–সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাপিয়ে পড়েছে। কিছু, না–সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম কি সাপ ভাই? ইন্দ্র কহিল, সবরকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত-জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে–কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখছিস্ নে? সে ত দেখছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রুক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না।ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে-দুটো-তিনটে আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়–সেগুলো বোড়া-ঢোঁড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল আমার কানে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক- নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল-ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি ? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে

সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়াময়ও কি ও পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল। আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না– 'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু, খেলা নয়!জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়েসে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল–মরতে একদিন ত হবেই–এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এতবড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল–সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কতকাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই ! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদবুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে–কেবল একটা নিস্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বার বার এই প্রশ্নই করিতেছে–ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে ? যাক সে কথা ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে,তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না –তাহাই প্রধাবিত হইতেছে।বেশ অনুভব করিতেছিলাম। জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধুসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে।ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বৈটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল,আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে বলিলাম , ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল,এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম,সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূরর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

****

-: শব্দার্থ :-

অপরিমেয় = যাহার পরিমান করা যায় না । আপদ মস্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত

-: অনুশীলনী :-

আকলন

১) লেখ:

(অ) বনে যে সব রকমের সাপ আছে ....

(আ) কারণ লেখ :

(১) বনের মধ্যে হঠাৎ চমকে উঠলাম ....

(২) চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল ....

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও : (১) শ্রীকান্ত (২) ইন্দ্র

শব্দ সম্পদ

(২) (অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :
অনুকূল,বিঘ্ন,সংকুচিত,ক্ষুদ্র,সোজা,নিস্ফল,নিচে,ব্যর্থ

(আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :
স্বর্গ,ডাকা,পৃথিবী,নৌকা,উপায়,অবহেলা, ধীবর,অপেক্ষা

(ই) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-
জল,কল্পনা,প্রবাহ, প্রবল,বন,বিষ

অভিব্যক্তি

(৩) (অ) জীবনে চলার পথে আত্ম বিশ্বাসের খুবই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করো।

(আ) প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় বিপদের সময়েই পাওয়া যায়।এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করো।

পাঠের উপর আধারিত লঘুওরী প্রশ্ন

(৪) (অ) ইন্দ্র,শ্রীকান্তকে আত্মরক্ষা করার যে সোজা উপায় দেখাইয়া দিয়াছিল তাহা আলোচনা করো।

(আ) নৈশ অভিযান কাহিনীতে - ইন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

(ই) ইন্দ্রের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিটি হঠাৎ পাশের ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করিল কেন তাহা আলোচনা করো।

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ) (১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দাও।

(২) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত সাহিত্যের পরিচয় দাও।

(আ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাস অনুসারে নিম্নলিখিত রচনার তালিকা তৈরী করো । (বড়দিদি, পন্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ , দেনা পাওনা , পথের দাবি , রামের সুমতি , মেজদিদি , আঁধারে আলো)

****

৫. নুন

জয় গোস্বামী

জয় গোস্বামী - জন্ম ১০ই নভেম্বর ১৯৫৪ । শৈশবে পিতৃহীন হন। কিশোর বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। ব্যক্তিজীবনে দরিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ক্রীসমাস ও শীতের সনেট গুচ্ছ।’ এছাড়া ‘ঘুমন্ত ঝাউগাছ’, ‘প্রত্নজীব’, ‘ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা’ প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ এবং গদ্যরচনাও প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গেওযুক্ত আছেন। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে তাঁর কাব্য ‘পাগলী তোমার জন্য’। ‘নুন’ কবিতাটি ‘ভুতুমভগবান’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

-: কবিতার মূল কথা :-

‘নুন’ কবিতাটি এক নিম্নবিত্ত পরিবারের দিনযাপনের কাহিনী। সাধারণ ভাত-কাপড়ের সন্ধানে আর অসুখ-বিসুখ ও ধার দেনাতেই জীবন কেটে যায় নিম্নবিত্ত মানুষের। কষ্টের জীবনে তাদের পক্ষে রোজ বাজার করা সম্ভব হয়না। তাদের শুকনো ভাতের সঙ্গে শুধু সামান্য লবনের প্রত্যাশা।

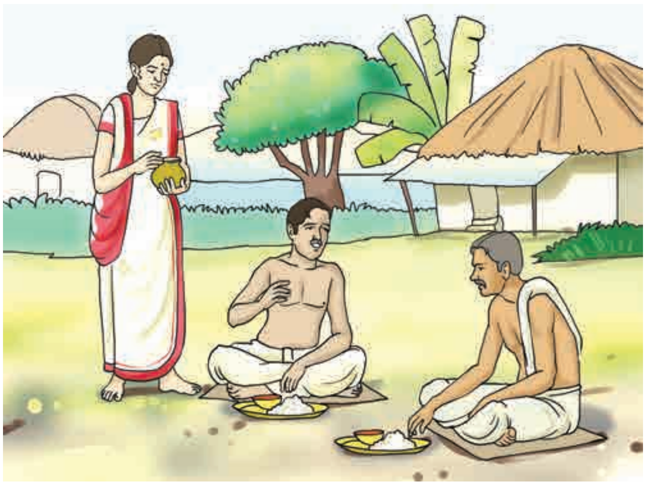

আমরা তো অল্পে খুশি; কী হবে দুঃখ করে ?
আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাতকাপড়ে।

চলে যায় দিন আমাদের অসুখে ধারদেনাতে
রাত্তিরে দু-ভাই মিলে টান দিই গঞ্জিকাতে

সব দিন হয়না বাজার; হলে, হয় মাত্রাছাড়া
বাড়িতে ফেরার পথে কিনে আনি গোলাপচারা

কিন্তু, পুঁতবো কোথায় ? ফুল কি হবেই তাতে ?
সে অনেক পরের কথা। টান দিই গঞ্জিকাতে।

আমরা তো এতেই খুশি; বলো আর অধিক কে চায় ?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়

মাঝে মাঝে চলেও না দিন, বাড়ি ফিরি দুপুররাতে
খেতে বসে রাগ চড়ে যায়, নুন নেই ঠান্ডা ভাতে

রাগ চড়ে মাথায় আমার, আমি তার মাথায় চড়ি
বাপব্যাটা দু-ভাই মিলে সারাপাড়া মাথায় করি

করি তো কার তাতে কী ? আমরা তো সামান্য লোক
আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক ।

****

-: শব্দার্থ :-

ভাতকাপড়	=	অন্নবস্ত্র	শুকনো ভাত	=	শুধু ভাত
গঞ্জিকা	=	গাঁজা	বাপব্যাটা	=	পিতা-পুত্র

অনুশীলনী

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :

অ) ছক পূর্ণ করো:-

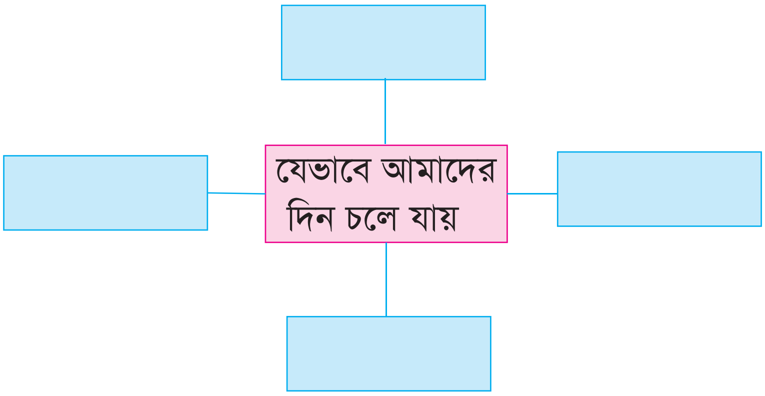

আ) কারণ লেখ :

(১) খেতে বসে রাগ চড়ে যাওয়ার কারণ -

(২) মাঝে-মাঝে দিন না চলার কারণ -

(৩) রাত্তিরে দু-ভাই মিলে গঞ্জিকাতে টান দেওয়ার কারণ -

কাব্যসৌন্দর্য

২) (অ) নিজেদের অধিকারের দাবি-যে দুটি পঙক্তিতে উল্লেখিত হয়েছে, সে দুটি পঙক্তির অর্থ লেখ।

(আ) ‘নুন’ কবিতায় কিনে আনা গোলাপ চারাটি কিসের প্রতীক ?

(১) ধনী ব্যক্তিদের সৌন্দর্য বিলাসের প্রতীক।

(২) নিম্ন মধ্যবিত্তের গোপনে লালিত সৌন্দর্য বিলাসের প্রতীক।

(৩) মধ্যবিত্তের সৌন্দর্যবিলাসের প্রতীক।

অভিব্যক্তি

৩) (অ) 'দুঃখ ভোলানোর জন্য ধুম্রপান বা মদ্যপান করা উচিত নয়'-এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

(আ) ‘গরীব-দুঃখীদের প্রতি মমত্ত্ববোধ থাকা প্রয়োজন’- এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

ই)‘আমরা তো অল্পেখুশি’- এই বাক্যটির মাধ্যমে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

রসাস্বাদন

৪) কোন পঙক্তির মাধ্যমে নিম্নবিত্ত শ্রেনির অনিয়মিত, সংশয়ে ঘেরা জীবনচিত্রই তুলে ধরা হয়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

অ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ করো :-

১) আমাদের দিন চলে যায় সাধারন ভাত-কাপড়ে ।

২) সবদিন হয়না বাজার ।

আ) জয় গোস্বামীর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ ।

৬) বাক্য সংকোচন (এক কথায় প্রকাশ করো)

১)ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন যিনি -

২)চৈত্র মাসের ফসল -

৩)দিবা করে ঘে -

৪)যিনি তর্ক করিতে পারেন -

৫)যে দিনে একবার আহার করে-

৬) যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে -

৭) দিনের শেষ -

৮) যে বিদেশে থাকে -

৯)যাহা অবশ্যই ঘটিবে -

১০)যাহাপ্রয়োজন নাই -

১১)আকাশে চরে যে -

১২)যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না -

১৩)পঙ্কে জন্মে যাহা -

১৪)যিনি গান গাইতে পারেন -

****

৬ .ডাকাতের মা

- সতীনাথ ভাদুড়ী

সতীনাথ ভাদুড়ী - জন্ম ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে,পূর্ণিয়া, বিহার; মৃত্যু ৩০শে মার্চ, ১৯৬৫। অর্থনীতিতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী নেওয়ার পর আইন পাশ ক'রে আইনজীবী বাবার সঙ্গে কিছুকাল ওকালতি করেন, পরে তা ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চলে গঠনমূলক কাজ করতে থাকেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪- এর মধ্যে দীর্ঘ সময় কারাবাস করেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ১৯৪৫-এ রচিত উপন্যাস 'জাগরী' তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। এর জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারও পান (১৯৫০)।এছাড়াও ঢোড়াই চরিতমানস , চিত্রগুপ্তের ফাইল প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর ছোটোগল্পগুলিও জোরালো বক্তব্য ও ভাষার জন্য সমান জনপ্রিয়।

-:পাঠের মূলকথা:-

ডাকাতের মা গল্পের মাধ্যমে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ; যারা অপরাধমূলক কাজ করে থাকে। গল্পটি সৌখী ডাকাতের মায়েরই গল্প। সেই মায়ের চিন্তা, ভাবন, দুঃখ,কষ্ট, আশা- আকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতি নিয়ে এই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারই অর্থাৎ সেই মায়ের ভুলের জন্যই কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও সৌখীকে পুনরায় জেলে যেতে হয়েছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলো সৌখীর মা।

আগে সে ছিল ডাকাতের বউ। সৌখীর বাপ মরে যাবার পর থেকে তার পরিচয় ডাকাতের মা বলে।ডাকাতের মায়ের ঘুম কি পাতলা না হলে চলে! রাতবিরাতে কখন দরজায় টোকা পড়বে তার কি ঠিক আছে! টকটক করে দু টোকার শব্দ থেমে থেমে তিনবার হলে বুঝতে হবে দলের লোক টাকা দিতে এসেছে। তিনবারের পর আরওএকবার হলে বুঝতে হবে যে, সৌখী নিজে বাড়ি ফিরল। ছেলের আবার কড়া হুকুম 'তখনই দরজা খুলবি না হুট করে! খবরদার! দশবার নিশ্বাস ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবি । তারপর দরজা খুলবি।' আরও কত রকমের টোকা মারবার রকমফের আছে। কতবার হয়েছে, কতবার বদলেছে। দুনিয়ায় বিশ্বাস করবে কাকে; পুলিসকে ঠেকানো যায়; কিন্তু দলের কারও মনে যখন পাপ ঢোকে তখন তাকে ঠেকানো হয় মুশকিল। দিনকালই পড়েছে অন্যরকম! সৌখীর বাপের মুখে শোনা যে, সেকালে দলের কে যেন জখম হয়ে ধরা পড়বার পর , নিজের হাতে নিজের জিব

কেটে ফেলেছিল–পাছে পুলিসের কাছে দলের সম্বন্ধে কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে। আর আজকাল দেখ! সৌখী জেলে গিয়েছে আজ পাঁচ বছর; প্রথম দু বছর দলের লোক মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেত; তিন বছর থেকে আর দেয় না। এ কি কখনও হতে পারত আগেকার কালে? ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্যের পাটই কি একেবারে উঠে গেল দুনিয়া থেকে? সৌখীর বাপ কতবার জেলে গিয়েছে;সৌখীরও তো এর আগে দুবার কয়েদ হয়েছে; কখনও তো দলের লোকে এর আগে এমন ব্যবহার করেনি। মাস না যেতেই হাতে টাকা এসে পৌঁছেছে-কখনও বা আগাম–তিন-চার মাসের এক সঙ্গে। কিন্তু এবার দেখ তো কাণ্ড! একটা সংসার পয়সার অভাবে ভেসে গেল কিনা তা একবার উঁকি মেরে দেখল না দলের লোক! আগের বউমার শরীরটা ছিল ভাল । সৌখীর এবারকার বউটা রোগা-রোগা তার উপর ছেলে হবার পর একেবারে ভেঙে গিয়েছে শরীর। সৌখী যখন একবার ধরা পড়ে, তখন বউমার ছেলে পেটে। হ্যাঁ, নাতিটার বয়স চার-পাঁচ বছর হল বইকি। কী কপাল নিয়ে এসেছিল যার বাপের নামে চৌকিদারসাহেব কাঁপে, দারোগাসাহেব পর্যন্ত যার বাপকে তুইতোকারি করতে সাহস করেননি কোনোদিন, তারই কিনা দুবেলা ভাত জোটে না ! হায় রে কপাল! এ বউমা যে খাটতে পারে না ঐ রোগা শরীর নিয়ে। আমি বুড়ো মানুষ, কোনোরকমে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুটো খই-মুড়ি বেচে আসি। তা দিয়ে নিজের পেট চালানোই শক্ত। সাধে কি আর বউমাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল! তাছাড়া গয়লাবাড়ির মেয়ে। ঝি-চাকরের কাজও তো আমরা করতে পারি না । করলেই বা রাখত কে? সৌখীর মা-বউকে কি কেউ বিশ্বাস পায়! নইলে আমার কি ইচ্ছা করে না যে, বউ - নাতিকে নিয়ে ঘর করি ! বেয়াইয়ের দুটো মোষ আছে। তবু বউ - নাতিটার পেটে একটু একটু দুধ পড়ছে। ওদের শরীরে দরকার দুধের। আর বছরখানেক বাদেই তো সৌখী ছাড়া পাবে। তখন বউকে নিয়ে এসে রুপোর গয়না দিয়ে মুড়ে দেবে। দেখিয়ে দেব পাড়ার লোকদের যে, সৌখীর মায়ের নাতি পথের ভিখিরী নয় । আসতে দাও না সৌখীকে! দলের ওই বদলোকগুলোকেও ঠাণ্ডা করতে হবে । আমি বলি, এসব একলসেঁড়ে লোকদের দলে না নিলেই হয়। ওরা কি ডাকাত নামের যুগ্যি; চোর, ছিচকে চোর! ওই যেটা টাকা দিতে আসত, সেটার চেহারা দেখেছ ? তালপাতার সেপাই । থুতনির নিচে দুগাছা দাড়ি! কালি - ঝুলিই মাখ, আর মশালই হাতে নাও, ওই রোগা-পটকাকে দেখে কেউ ভয় পাবে কস্মিনকালে ?

ঘুম আর আসতে চায় না । রোজ রাতেই এই অবস্থা। মাথা পর্যন্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকিয়ে না নিলে তার কোনো কালেই ঘুম হয় না শীতের দিনে।

একবার সৌখী কোথা থেকে রাত-দুপুরে ফিরে এসে টোকার সাড়া না পেয়ে, কী মারই মেরেছিল মাকে! বলে দিয়েছিল যে ফের যদি কোনোদিন নাকমুখ ঢেকে শুতে দেখি, তাহলে

খুন করে ফেলে দেব! বাপের বেটা, তাই মেজাজ অমন কড়া। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলেও একটা বকুনি দেবার লোক পর্যন্ত নেই বাড়িতে, গেল পাঁচ বছরের মধ্যে! একি কম দুঃখের কথা । ঘুমের অসুবিধা হলেও, ছেলের কথা মনে করে সে এক দিনের জন্যও নাকমুখ ঢেকে শোয়নি পাঁচ বছরের মধ্যে। বাইরে নোনা আতা গাছতলায় শুকনো পাতার উপর একটু খড়খড় করে শব্দ হল। গন্ধগোকুল কিংবা শিয়ালটিয়াল হবে বোধ হয়। কী খেতে যে এরা আসে বোঝা দায় . . . বুড়ো হয়ে শীত বেড়েছে। আগে একখান কম্বলে কেমন দিব্যি চলে যেত।এ কম্বলখানা হয়েওছে অনেক কালের পুরনো। এর আগের বার সৌখী জেল থেকে এনেছিল। সে কি আজকের কথা।কম্বলখানার বয়স ক'বছর হবে তার হিসাব করতে গিয়ে বাধা পড়ে। টকটক করে টোকা পড়ার মতো শব্দ যেন কানে এল। টিকটিকির ডাক বোধ হয়! হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে! টিকটিকিটা সুদ্ধ খুনসুড়ি আরম্ভ করেছে মজা দেখবার জন্য। করে নে।

টকটক করে আবার দরজায় দুটো-টোকা পড়ল।...না। তাহলে টিকটিকি না তো। আওয়াজটা খনখনে-টিনের কপাটের উপর টোকা মারবার শব্দ! বুড়ি উঠে বসে । ঘর গরম রাখার জন্য সে আগুন করেছিল মেঝেতে,সেটা কখন নিভে গিয়েছে ; কিন্তু তার ধোঁয়া ঘরের অন্ধকারকে আরও জমাট করে তুলেছে ।

......এতদিনে কি তাহলে দলের হতভাগাগুলোর মনে পড়েছে সৌখীর মায়ের কথা? আবার দরজায় দুটো টোকা পড়ল। আর সন্দেহ নেই ! অনেক দিনের অনভ্যাসের পর এই সামান্য ব্যাপারটা বুড়ির মনের মধ্যে একটু উত্তেজনা এনেছে । তবু বলা যায় না । .কে না কে সৌখীর মা আস্তে আস্তে উঠে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় । বন্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে বাইরের লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল ।. . লোকটাও বোধ হয় কপাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। বিড়ির গন্ধ নাকে আসছে । আবার টোকা পড়ল দুটো। এবার একেবারে কানের কাছে। এ টোকা পড়বার কথা ছিল না! অবাক কাণ্ড! তাহলে তো লোকটা টাকা দিতে আসেনি! পুলিশের লোকটোক নয় তো? টোকা মারবার নিয়মকানুনগুলো হয়তো ভাল জানে না ! সৌখীর ছাড়া পাবার যে এখনও বহু দেরি ! নিশ্চয়ই পুলিশের লোক ! তবে তুমি যে-ই হও, টাকা দিলে নিশ্চয়ই নিয়ে নেব; তার পর অন্য কথা।. .কথা বলতে হবে সাবধানে, দলের কারও নামধাম আবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে না পড়ে অজানতে। হঠাৎ মনে পড়ল, হুড়কো খুলবার আগে দশবার নিশ্বাস ফেলবার কথা। মানসিক উত্তেজনায় নিশ্বাস পড়ছেই না তা গুনবে কী। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বুড়ি তাড়াতাড়ি দশবার নিশ্বাস ফেলে নিয়মরক্ষা করে নিল। 'কে?' দরজা খুলে সম্মুখে এক লম্বাচওড়া লোককে দেখে ডাকাতের মায়েরও গা ছমছম করে। 'ঘর যে একবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঢুকি

কী করে ?’ কে , সৌখী । ওমা তুই । আমি ভাবি কে না কে ।’বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে। এ ছেলে বুড়ো হয়েও সেই একই রকম থেকে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরছে; বুক ফুলিয়ে পাড়া জাগিয়ে ঢুকতে পারত বাড়িতে অনায়াসে। কিন্তু দরজায় টোকা মেরে মা'র সঙ্গে খুনসুড়ি হচ্ছিল এতক্ষণ। এ আনন্দ তার রাখবার জায়গা নেই ।

'লাটসাহেব জেল দেখতে গিয়েছিল। আমার কাজ দেখে খুশী হয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম দিয়ে দিল। খুশী আর কী। হেড জমাদার সাহেবকে টাকা খাইয়েছিলুম। সে-ই সুপারিশ করে দিয়েছিল জেলারবাবুর কাছে। তাই বেশি রেমিশন পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, তুই কুপিটা জ্বাল তো আগে। তারপর সব কথা হবে।’

দরকারের চাইতেও জোরে কথাগুলো বলল সৌখী যাতে ঘরের অন্য সকলে শুনতে পায়। তারপর মাকে কেরোসিন তেলের টেমিটাকে খুঁজতে সাহায্য করবার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তুলে ধরে। বুড়ি এতক্ষণে আলোতে মুখ দেখতে পেল ছেলের। চুলে বেশ পাক ধরেছে এবার; তাই বাপের মুখের আদল ধরা পড়ছে ছেলের মুখে। রোগা-রোগা লাগছে যেন। সৌখীটার তো বাপের মতো জেলে গেলে শরীর ভাল হয়। তবে এবার এমন কেন ? ছেলের চোখের চাউনি ঘরের দূর দেওয়াল পর্যন্ত কী যেন খুঁজছে । কাদের খুঁজছে সে কথা আর বুড়িকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে না। “হ্যা রে, জেলে তোর অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি ?”

সৌখী এ প্রশ্ন কানে তুলতে চায় না, জিজ্ঞাসা করে, 'এদের কাউকে দেখছি না?’ প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয়ই করছিল । জানা কথা যে, জিজ্ঞাসা করবেই....তবু..... ‘বউ বাপের বাড়ি গিয়েছে ।’'হঠাৎ বাপের বাড়ি ?’. . . এতদিন পর বাড়ি ফিরেছে ছেলে। এখনই সব কথা খুলে বলে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে চায় না।মরদের রাগ। শুনেই এখনই হয়তো ছুটবে রাগের মাথায় দলের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।. . নাতি আর বউয়ের শরীর খারাপের কথাও এখনই বলে কাজ নেই। ছেলে ছেলে করে মরে সৌখী। আগের বউটার ছেলে পিলে হয়নি। এ বউয়ের ওই একটিই তো টিমটিম করছে। তার শরীর খারাপের কথা শুনলে হয়তো সৌখী এখানে আর একদিনও থাকবে না। এতদিন পর এল। একদিনও কাছে রাখতে পারব না? খেয়ে-দেয়ে জিরিয়ে সুস্থির হয়ে থাকুক এক-আধদিন। তারপর সব কথা আস্তে আস্তে বলা যাবে।...‘কেন, মেয়েদের কি মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করে না একবারও?’

‘না না, তাই কি বলছি নাকি?’ অপ্রতিভের চেয়ে হতাশ হয়েছে বেশি সৌখী। তার বাড়ি ফিরবার আনন্দ অর্ধেক হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। ছেলেটা কেমন দেখতে হয়েছে, তাই নিয়ে কত কল্পনার ছবি এঁকেছে জেলে বসে বসে। ছেলে কেমন করে গল্প করে মায়ের সঙ্গে তাই শুনবার জন্য টোকা মারবার আগে দরজায় কান ঠেকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল রাত ন'টার মধ্যে দুরন্ত ছেলেটা

নিশ্চয়ই ঘুমোবে না। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে যে কালই সে যাবে শ্বশুরবাড়ি বউছেলেকে নিয়ে আসতে । এ কথা এখনই মাকে বলে ফেলা ভাল দেখায় না; নইলে মা আবার ভাববে যে নতুন বউ এসে ছেলেকে পর করে নিয়েছে। মা কত কী বলে চলেছে; এতক্ষণে শেষের কথাটা কানে গেল।'নে, হাতমুখ ধুয়ে নে।' 'না না। আমি খেয়ে এসেছি । এই রাত করে আর তোকে রাঁধতে বসতে হবে না।' 'না, রাঁধছে কে খইমুড়ি আছে । খেয়ে নে । তুই যে কত খেয়ে এসেছিস, সে আর আমি জানি না।' ব্যাবসার পুঁজি খইমুড়িগুলো শেষ করে শোয়ার সময় তার হঠাৎ নজর গেল মা'র গায়ের ছেঁড়া কম্বলখানার দিকে। 'ওখান আমাকে দে।' আপত্তি ঠেলে সৌখী নিজের গায়ের নতুন কম্বলখানা মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিল। নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েও বুড়ির ঘুম আসতে চায় না। পা কিছুতেই গরম হয় না, রাজ্যের দুশ্চিন্তায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সৌখীর নাকডাকানির একঘেয়ে শব্দ কানে আসছে। এতদিন পর ছেলে বাড়ি এল; কোথায় নিশ্চিন্ত হবে, তা নয়, সৌখীকে কী খেতে দেবে কাল সকালে, সেই হয়েছে বুড়ির মস্ত ভাবনা। আজকের রাতটা না-হয় বিক্রির খইমুড়ি দিয়ে কোনোরকমে চলে গেল। যদি বলত দুটো ভাত খেতে ইচ্ছা করছে, তাহলেই আর উপায় ছিল না, সব কথা না ব'লে । আলু-চচ্চড়ি খেতে কী ভালই বাসে সৌখীটা ! কতকাল হয়তো জেলে খেতে পায়নি। আলু,চাল, সরষের তেল সবই কিনতে হবে। অত পয়সা পাব কোথায়? ভোরে উঠেই কি ছেলেকে বলা যায় যে, আগে পয়সা যোগাড় করে আন, তবে রেঁধে দেব! কাছারির ঘড়িতে দুটো বাজল। ভেবে কূল - কিনারা পাওয়া যায় না। মনে পড়ল যে, পেশকারসাহেবের বাড়ি রাজমিস্ত্রী লেগেছে। আজ যখন মুড়ি বেচতে গিয়েছিল তখন দেখেছে যে,পড়ে-যাওয়া উত্তরের পাঁচিলটা গাঁথা হচ্ছে। বুড়ি বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে বেরুল ঘর থেকে।

মাতাদীন পেশকারের বাড়ি বেশি দূরে নয়। পাঁচিল সেদিন হাত দুই-আড়াই উঁচু পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে। মাটি আর ভাঙা ইটের পাহাড় নিচে পড়ে থাকায়, সে পাঁচিল ভাঙতে বুড়ির বিশেষ অসুবিধা হল না। বাড়ি নিশুতি! অন্ধকারে কী কোথায় আছে ঠাহর করা শক্ত। বারান্দায় দোর-গোড়ায় গুছিয়ে রাখা রয়েছে পেশকার সাহেবের খড়মজোড়া, আর জলভরা ঘটি—ভোরে উঠেই দরকার লাগবে বলে । ভয়ে বুড়ি উঠোনের আর কোথায় কী আছে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজবার চেষ্টা করল না। ঘটিটি তুলে নিয়ে পাঁচিল টপকে বাইরে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জলটুকু পর্যন্ত ফেলেনি। এখন রাতদুপুরে লোটা হাতে যেতে দেখলেও কেউ সন্দেহ করবে না।

এদেশে লোটা বিনা সংসার অচল। দিনে বারকয়েক লোটা না মাজলে মাতাদীন পেশকারের হাত নিশপিশ করে। সেইজন্য হুলস্থূল পড়ে গেল তাঁর বাড়িতে সকালবেলায়। খোকার মা নাকে কেঁদে স্বামীকে

মনে করিয়ে দিলেন যে, লোটা হল বাড়ির লক্ষ্মী; এখনই আর একটি কিনে আনা দরকার বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনতে হলে। কর্তার মেজাজ তখন তিরিক্ষি হয়ে আছে চোরের উপর রাগে। -বাজে বকবক কোরো না। তোমাদের তো কেবল এই! আইনের ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, চুরির খবর পুলিশকে না দিলে জেল পর্যন্ত হতে পারে; সে খবর রাখো?' আইনচঞ্চু মাতাদীন আরও অনেক ঝাঁঝালো কথা খোকার মাকে শোনাতে শোনাতে বাড়ি থেকে বার হয়ে 'গেলেন থানায় খবর দেবার জন্য।'

ফিরতিমুখে তিনি এলেন বাসনের দোকানে। নানা রকম ঘটি দেখাল দোকানদার; কিন্তু পছন্দসই কিছুতেই পাওয়া যায় না। পেশকারসাহেব বড় খুঁতখুতে লোটা সম্বন্ধে । তিনি চান খুরো-দেওয়া লোটা-বুঝলে কিনা- এই এত বড় সাইজের - মুখ হওয়া চাই বেশ ফাঁদালো—যাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মেয়েমানুষের এতখানি মোটা রুপোর কাঁকনসুদ্ধ হাত অনায়াসে ঢোকানো যায়, ভিতরটা মাজবার জন্য।.দোকানদার শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে- 'পুরনো হলে চলবে? নামেই পুরনো। শস্তায় পাবেন। আড়াই টাকায়।''পুরনো বাসনও বিক্রি হয় নাকি এখানে? দেখি।' ঘটি দেখেই তাঁর খটকা লাগল। পকেট থেকে চশমা জোড়া বার করে নাকের ডগায় বসালেন। খুরোর নিচে ঠিক সেই তারা আঁকা । আর সন্দেহ নেই ! মাতাদীন পেশকার আইনের ধারা ভুলে গিয়ে দোকানদারের টুঁটি চেপে ধরেন ।-' বল! এ লোটা কোত্থেকে পেলি? দিনে করিস দোকানদারি - আর রাতে বার হস সিঁধকাঠি নিয়ে !'একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড । দোকানে লোক জড় হয়ে গেল । দোকানদার বলে যে, সে কিনেছে এই ঘটি নগদ চোদ্দ আনা পয়সা গুনে, সৌখীর মায়ের কাছ থেকে – এই কিছুক্ষণ মাত্র আগে ।'চোদ্দো আনায় এই ঘটি পাওয়া যায় ? চোরাই মাল জেনেই কিনেছিস ! চোরাই মাল রাখবার ফৌজদারী ধারা জানিস? 'পেশকারসাহেব থানায় পাঠিয়ে দিলেন একজন ছোকরাকে, দারোগাকে ডেকে আনবার জন্য। চোর ধরা পড়বার পর দারোগাসাহেবের কাজে আর ঢিলেমি নেই। তখনই সাইকেলে এসে হাজির। সব ব্যাপার শুনে তিনি সদলবলে সৌখীর বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। সৌখীর মা আলুর তরকারি চড়িয়েছে উনোনে। ছেলে তখনও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে।অনেককাল জেলে ঘড়ি ধরে সকাল সকাল উঠতে হয়েছে; নতুন-পাওয়া স্বাধীনতা উপভোগ করবার জন্য সৌখী মনে মনে ঠিক করেছে যে বেলা বারোটার আগে সে কিছুতেই আজ বিছানা ছেড়ে উঠবে না । দারোগা-পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে । পুলিশ দেখে ভয় পাবার লোক সে নয়; এর আগে কতবার সময়ে অসময়ে পুলিশকে তাদের বাড়িতে হানা দিতে দেখেছে । কিন্তু আজ যে ব্যাপার অন্য! মাতাদীন পেশকার আর বাসনওয়ালা যে পুলিশের সঙ্গে রয়েছে! তার যে ধারণা ছিল, বাসনওয়ালারা পুরনো বাসনগুলোকে রং- চং

দিয়ে নতুনের মতো না করে নিয়ে বিক্রি করে না.... পাঁচ-সাত বছর আগে পুলিশ একবার ভোর রাত্রে তাদের বাড়ি ঘেরাও করছিল,বন্দুকের খোঁজে। তখন তো মাথা হেঁট হয়নি তার। ডাকাতি করা তার স্বামী পুত্রের হকের পেশা । সে তো মরদের কাজ; গর্বের জিনিস। জেলে যাওয়া সেক্ষেত্রে দুরদৃষ্ট মাত্র - তার চেয়ে বেশি কিছু নয় । কিন্তু এ যে চুরি !ছিঁচকে চোরের কাজ শেষকালে. লজ্জায় সৌখীর মা অভিযোগ অস্বীকার করতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে !দারোগাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে, 'তুই এই লোটা আজ বাজারে বাসনের দোকানে চোদ্দ আনায় বিক্রি করেছিস?'কোনো জবাব বেরুল না বুড়ির মুখ দিয়ে। শুধু একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে সে মাথা হেঁট করে নিল ।এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা। চোদ্দ আনা পয়সার জন্য মা শেষকালে একটা ঘটি চুরি করল! কেন মা তাকে বলল না! এতদিন তার ডিউটি ছিল জেলখানার গুদামে। জেলের ঠিকেদারদের কাছ থেকে সে নব্বই টাকা রোজগার করে এনেছে । এখনও সে টাকা তার কোমরের বাটুয়ায় রয়েছে। মা তার কাছ থেকে চেয়ে নিল না কেন? মেয়েমানুষের আর কত আক্কেল হবে! হয়তো ঘরদোরের দিকে তাকিয়ে এক নজরেই সংসারের দৈন্যদশার কথা আঁচ করে নেওয়া উচিত ছিল তার! বুঝে, নিজে থেকেই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সময় পেল কই? রাতে এসে শুয়েছে; এতক্ষণ তো বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। শেষ পর্যন্ত লোটা চুরি! জেলের মধ্যে ওই সব ছিঁচকে 'কদুচোর'দের সঙ্গে সে যে পারতপক্ষে কথা বলেনি কোনো দিন! ডাকাতরা জেলে আলাপ-সালাপ করে 'লাইফার'দের সঙ্গে, এ কথা তো মায়ের অজানা নয়।.... 'কদুচোর'দের যে মাত্র দু-মাস তিন মাসের সাজা হয় । মা কি জানে না যে.... 'এইবুড়ি! আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? বল। জবাব দে।' বুড়ি নির্বাক। দারোগাবাবুর প্রশ্ন কানে গেল কি না, সে কথা বোঝাও যায় না তার মুখ দেখে ।আর থাকতে পারল না সৌখী ।দারোগাসাহেব, মেয়েমানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন ? আমি ঘটি চুরি করেছি কাল রাত্রে।' বিজ্ঞ দারোগাবাবু তাঁর অনুচরদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টি হেনে ভাব দেখাতে চাইলেন যে, এত বেলা পর্যন্ত সৌখীকে ঘুমোতে দেখে, এ তিনি আগেই বুঝেছিলেন; শুধু বুড়ির মুখ দিয়ে কথাটা বার করে নিতে চাচ্ছিলেন এতক্ষন। এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল... ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে । 'না না দারোগাসাহেব! সৌখী করেনি, আমি করেছি। ওকে গ্রেপ্তার করবেন না। আমাকে করুন। ও কিছু জানে না। ও যে ঘুমুচ্ছিল। ওকে ছেড়ে দিন দারোগাসাহেব। এখনও যে বউ-ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। দারোগাবাবুর পায়ের উপর মাথা কুটছে বুড়ি। কিন্তু তিনি বাসনওয়ালা কিংবা এই বুড়িটাকে নিয়ে মাথাঘামাতে চান না, তাঁর দরকার আসল অপরাধীকে নিয়ে।

সৌখী যাবার সময় কোমর থেকে বাটুয়াটা বার করে রেখে দিয়ে গেল খাটিয়ার উপর।মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উনোনে চড়ানো আলুর তরকারির পোড়া গন্ধ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

****

-: শব্দার্থ :-

টোকা = আঙ্গুল দিয়ে হাল্কা আঘাত, হুকুম = আদেশ, কুপি = কেরোসিনের বাতি, মরদ= জোয়ান লোক, ঘুট ঘুটে= ঘন, দুরন্ত= চঞ্চল, হেঁট= নীচু, অভিযোগ= নালিশ,

-: অনুশীলনী :-

আকলন

১) লেখ:

(অ) আলু চচ্চড়ি তৈরি করতে যা লাগে ....

(আ) কারণ লেখ :

(১) সৌখী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ছিল..........................

(২) সৌখীর মায়ের আর ঘুম আসতে চায়না..

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও :

(১) সৌখীর মা (২) সৌখী (৩) মাতাদীন পেশকার

শব্দ সম্পদ

(২)

(অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

চোর, বিশ্বাস, ঠান্ডা, রোগা, কলঙ্ক, অসুবিধা, আরম্ভ, শক্ত

(আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :

(১) প্রহরী, বৃত্তি,অনায়াসে,বিবেচনা,আদেশ ,সঙ্গী, সন্দেহ,সঞ্চিত ধন,উপস্থিত, সাদৃশ্য

অভিব্যক্তি

(৩)

(অ) মাতা - পিতার প্রতি ছেলে- মেয়েদের কর্তব্য কি তাহা ব্যক্ত করো।

(আ) সমাজে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের দুষ্পরিণাম এর পরিণতি বিষয়ে আলোচনা করো।

পাঠের উপর আধারিত লঘুত্তরী প্রশ্ন

(৪)

(অ)

(১) ডাকাতের মা গল্পটি তে লেখক যে সত্যটি উপস্থিত করেছেন তাহা আলোচনা করো।

(২) ডাকাতের মা গল্পের সৌখীর বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

(৩) ডাকাতের মা গল্পটি তে সৌখীর মায়ের চরিত্রটি বিবৃত করো।

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ)

(১)সতীনাথ ভাদুড়ীর পরিচয় দাও।

(২) সতীনাথ ভাদুড়ীর রচিত সাহিত্যের পরিচয় দাও।

(আ) সতীনাথ ভাদুড়ীর লিখিত গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাস অনুসারে নিম্নলিখিত রচনার তালিকা তৈরি করো।

(গণনায়ক, অপরিচিতা, চকাচকি, জলাভূমি, চিত্রগুপ্তের ফাইল, সংকট, দিকভ্রান্ত, অচিন রাগিনী)

লিঙ্গ পরিবর্তন করো ।

পুত্র ,রাজা, নমস্য ,ভাই ,নারী, বালিকা,শিক্ষক,নেত্রী ,মানব, রাজপুত্র ,কুমার,নায়ক , মাসী, বাঘ,পাগল,গায়ক,লেখক,নারী, বর

সমাস

সমাস - সংক্ষেপে সুন্দর করে বলার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশী পদকে এক পদে পরিনত করার নাম সমাস ।

ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখ।

খইমুড়ি	দিনরাত	ফুলবাগান	মাতা-পিতা	মধ্যবিত্ত
রাম - লক্ষণ	শোকসভা	জনবিরল	আমরন	সিংহাসন
পঞ্চবটি	দশানন	গানবাজনা	ত্রিজগৎ	নিরন্ন

****

৭. পাঁওদল

- প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবি পরিচিতি - (জন্ম : ১৯০৪ - মৃত্যু : ৩রা মে , ১৯৮৮) একজন বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী বাঙালি কবি, ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং চিত্রপরিচালক। তার জন্ম কাশীতে। তাঁর পিতার নাম তাপস মিত্র। তিনি রেলে চাকরি করতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতার বই 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। বৈপ্লবিক চেতনাসিক্ত মানবিকতা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম জীবনে তাঁর ছোটগল্পের তিনটি বই বেরোয়-'পঞ্চশর', 'বেনামী বন্দর' আর 'পুতুল ও প্রতিমা'। মানুষের সম্পর্কের ভাঙ্গাগড়া , মনের জটিলতা, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের ব্যথা বেদনার কথা প্রকাশে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন স্বকীয়তায় অনন্য।

-:কবিতার মূল কথা:-

সমাজে এতদিন মেহনতী মানুষের দল সমাজের কাছে হীন বলে প্রতিপন্ন হতো। কিন্তু আজকের দিনে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে মানবতার জয়গানে এরাও সমাজে মর্যাদা পেয়েছে। আজ এরা ভয়মুক্ত। এদের সাথে সবাইকে পা মিলিয়ে চলতে হবে।

পায়ের শব্দ শুনতে পাও ?
নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসঙ্গীত !
মলিন কোর্তাপরা কারখানার কুলি আসছে আজ অসঙ্কোচে
আর রাস্তার মূর্খ মজুর
জাহাজের খালাসী আর পথের মুটে ।বিশ্ব-মানবের
মিছিলে আজ মিলল এসে
এ কোন অপ্রত্যাশিত পূত বন্যা !
পঙ্কিল ব'লে ঘৃণা করবে আজ কে ?
কলুষিত ব'লে কে নাসিকা কুঞ্চিত করবে ?
তফাত যাও !
জরাজর্জর দেহে তাজা রক্তের স্রোত বইল ;
বদ্ধজলে মৃত্যুর জীবাণু বংশ বিস্তার ক'রছিল ,

আজ প্রানের বিপুল বেগে সাফ হয়ে গেল
বনেদি জঞ্জাল সনাতন ধাপ্পাবাজি ।
রাজপথের ধূলি আজ তাদের নগ্ন সবল চরণ
আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হ'ল ।
কলের কুলি আর মাঠের চাষা ,
রাস্তার মুটে আর কারখানার মজুর ।
পাল্কি চড়ে চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,-
আজ ওই নগ্ন সবল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল ।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারী হ'ল
পাপের ভারে –
ওই পুণ্য পথের ধুলায় নামাও সে ভার ।
আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা ।
আজ যদি চোখে জল আসে
সে কি দুর্বলতা ?
ওই কালিমাখা শ্রম-কঠোর ঘর্মাক্ত দেহখানি
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হ'তে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা ?
দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই
নগ্নপদ কুলিদের সাথে ভাই –
তিনি যে আজ আহ্বান করেছেন ওই পথের ধুলায় !

****

-: শব্দার্থ :-

পাঁওদল	=	পদচারী শ্রমিক	অপ্রত্যাশিত	=	যা আশা করা যায় না
পূত	=	পবিত্র	অসংকোচ	=	দ্বিধা না করে
নিযুত	=	দশ লক্ষ	কোর্তা	=	ঢিলা পাজামা

-: অনুশীলনী :-

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :

রাজপথের ধুলি যাদের নগ্ন চরণ আলিঙ্গনে ধন্য হলো

আ) কারণ লেখ :-

(১) রাজপথের ধুলি ধন্য হওয়ার কারণ - ....

(২) বড়লোকদের পা ভারী হওয়ার কারণ - ....

(৩) পাল্কি চড়ে পা পঙ্গু হওয়ার কারণ - ....

কাব্যসৌন্দর্য

২) (অ) যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে দেবতা সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই পঙক্তিগুলির অর্থ লেখ ।

(আ) জরাজর্জর দেহে কোন রক্তের স্রোত বইল ?

(১) অশুদ্ধ রক্তের (২) তাজা রক্তের (৩) গরম রক্তের

অভিব্যক্তি

৩) (অ)‘নীচুতলার মানুষের প্রতি সহানুভূতি রাখা উচিত -’ এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

(আ) ‘শ্রমজীবি মানুষরাই সভ্যতার ধারক-বাহক ’ - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

রসাস্বাদন

৪) কোন পঙক্তিগুলির মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষকে একসাথে চলার কথা তুলে ধরা হয়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

(অ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ করো :-

১) পাল্কি চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে ?

২) দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই নগ্নপদ কুলিদের সাথে ভাই -

(আ) প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ ।

****

৮.বাঙ্গলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - (১০ই জুলাই ১৮৮৫ - ১৩ই জুলাই ১৯৬৯) ভারতীয় উপমহাদেশের একজন স্মরনীয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব, বহু ভাষাবিদ,বিশিষ্ট শিক্ষক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৯০৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পাস করেন।প্যারিস থেকে পি.এইচডি. ডিগ্রী ১৯২৫ সালে লাভ করেন। শহীদুল্লাহ্ সব সময়ই সাহিত্য কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। এম.এ. পাশ করার পরই তিনি বঙ্গীয়মুসলিম সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হন।

-:পাঠের মূলকথা:-

ছাত্র সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য, সাহিত্যকে সুন্দর করে তোলার জন্য ছাত্রদের দান অপরিসীম। সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে তারা অনেক কাজ করতে পারে। এই কাজ কঠিন ও নীরস মনে হলেও তারা যদি এই কাজ না করে তবে কারা করবে? সাহিত্যের উন্নতির জন্য তারা নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাই ছাত্রদের খুবই প্রয়োজন।

দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার যখন যাত্রীর মনকে নিরাশার গাঢ় আঁধারে ছাইয়া ফেলে,তখন পূব আকাশের ললাটে একটি ছোটো শুকতারা কি তার ক্ষীণ আলোকে সেই পথিকের কল্পনার আশার তরুণ অরুণচ্ছবি আনিয়া দেয় না ? ছাত্রগণ বাঙ্গলার আকাশভালে যখন তোমাদের মত এতগুলি শুকতারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন কেন না আমাদের চোখ আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতের ভাবী আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? তোমাদের অধ্যয়ন-ক্লিষ্ট মুখে গৌরবের ভাব, তোমাদের চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটে মহত্ত্বের রেখা, তোমাদের জাগরণ-ক্ষীণ চোখে প্রতিভার আলো, তোমাদের কষ্ট-সহিষ্ণু শরীরে সাধনার চিহ্ন-এ সব দেখিয়া মনে হয় তোমরা কোন অতীত যুগের রাজপুত্রের ন্যায় তোমাদের জন্মভূমির বহু যুগের দৈন্য ও পরতন্ত্রতার বেড়ী ভাঙ্গিয়া, তাহাকে মহত্ত্ব ও স্বতন্ত্রতার উন্মুক্ত রাজ্যে রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

কেবল পশুবলে জগতের কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই। কেবল অর্থ বলে কেহ বড় হয় নাই। জগতের জাতীয় মন্ডপে উচ্চাসন পাইতে গেলে চাই মস্তিষ্কের বল,যাহার বিকাশ সাহিত্যেও বিজ্ঞানে, আর চাই মনের বল, যাহার প্রকাশ চরিত্রে ও ব্যবহারে। বাঙ্গলার রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বাঙালীর মনীষার পরিচয় গর্ব্বিত পাশ্চাত্য জাতিকে দিয়াছেন।

কিন্তু দুই একটি কোকিলে কি বসন্তের সৌন্দর্য্য আনিতে পারে? চাই আমরা সহস্র কোকিলের কলতান, যাহা জগতের শীতস্তব্ধ বক্ষে বসন্ত যৌবনের অনন্ত উজ্জ্বল মধুর ভাব জাগাইয়া দিয়া বিশ্ববাসীর অনিচ্ছুক কর্ণকে ভারতের দিকে উৎকর্ণ করিবে।ভবিষ্যৎ ভারত অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ ও উজ্জ্বল হইবে ।ছাত্রবন্ধুগণ, তোমরা ভুলিও না -এই গুরু কার্য্যের ভার তোমাদেরই উপর ন্যস্ত।

আমি এস্থলে অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল সাহিত্যের কথা বলিব । জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের উন্নতির চিরসাথী। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্বন্ধে যে কথা, মধ্য যুগের আরব, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সম্বন্ধে সেই কথা, বর্তমান যুগের জার্ম্মানী ও রুসিয়া সম্বন্ধে সেই একই কথা,- সাহিত্যের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হয় না, কিংবা জাতীয় উন্নতি ব্যতিরেকে সাহিত্যের উন্নতি হয় না । এই জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সহায় সাহিত্য।সহস্র বীরপুরুষের তরবারি যে কার্য্য করিতে পারে না, এক বাগ্মীর রসনা তাহা করিতে পারে এবং সহস্র বাগ্মীর রসনা যাহা করিতে পারে না এক সাহিত্যিকের লেখনী তাহা করিতে পারে। অনৈতিহাসিকের নিকট কথাটা অত্যুক্তি দোষাঘ্রাত বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু বিজ্ঞ ইতিহাস ইহার অভ্রান্ত সাক্ষী। মাৎসিনীর রসনায় কি ইতালির জাতীয় নব জীবনের সূত্রপাত হয় নাই ? ভলতেয়ার ও বিশ্বকোষকারকগণের নিবন্ধমালা কি ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নবভাব আনিয়া দেয় নাই? আমাদের চোখের সম্মুখে নিটসে ও মার্কসে গর্কি ও টলস্টয় প্রভৃতির লেখনী কি জার্মানীতে ও রুসিয়ায় বহু যুগের উপাস্য ফেটিসকে চূর্ণ করিয়া জগতে স্বাধীনতা ও বিশ্বমানবতার নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে নাই? নাই থাক আমাদের বাহুবল, নাই থাক আমাদের ধনবল, যদি আমাদের সাহিত্য শক্তি থাকে তবে তাহা আলাদিনের প্রদীপের আমাদের ইপ্সিতকে আমাদের পদতলে আনিয়া দিবে জাতীয় উন্নতির জন্য, জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, অন্য সভ্য জাতির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আমাদের সাহিত্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও পুষ্টিতে শরীরের শক্তি ও পুষ্টি সমস্ত অঙ্গের সৌন্দর্য্যে আকৃতির সৌন্দর্য্য। তাই আমাদের সাহিত্যকে ষোল কলায় পূর্ণ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আশা মরু-মরীচিকা মাত্র।

আমাদের জাতীয় মহত্ত্বের জন্য বিরাট বিশাল অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর সাহিত্য-সৌধ রচনা করিতে হইবে । ভিত্তির ভাবনা করিতে হইবে না। চন্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, কাশীরাম, আলাওল প্রমুখ মহাজনগণ আমাদের সাহিত্যের বুনিয়াদ আগেই গড়িয়া গিয়াছেন। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, মসাররফ হোসেন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি সুধীগণ কিছু গঠন আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষী এই সৌধ রচনা কার্য্যে দ্রুত হস্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাসাদের গঠনের জন্য যেমন রাজমিস্ত্রী চাই, তেমনি যোগানদারও চাই। ছাত্রবন্ধুগণ, আমাদের এই সাহিত্যের বালাখানা গড়িতে তোমাদিগকে এখন যোগানদার সাজিতে হইবে কিংবা যোগানদারের যোগাড়ে’ বনিতে হইবে এখন পৃথিবীর সমস্ত জাতিই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছে । আমাদের সাহিত্যরথীদের পিছু পিছু তোমাদিগকে সাহিত্যের পদাতিক বা সাহিত্যের কুলী হইতে হইবে । কোন্ সন্তান আছে, যে মাতৃভূমির গৌরবের জন্য ক্ষুদ্রতম কাজকে ঘৃনা করিবে? যদি কেহ করে সেই বাঙালী অধম,সেই ঘৃণ্য অতি ঘৃণ্য।ছাত্রগণ, তোমাদের সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ; এখন তোমরা অনন্যকর্ম্মা, অনন্যমনা হইয়া ভাষার তিমির-খনি হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেছ । সেই সমস্ত নিজেরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া মাতৃভাষার পদে উপহার দাও, তোমরা ধন্য হইবে, মাতৃভাষাও বরেণ্যা হইবে। ছাত্রজীবনের এই **মাহেন্দ্রক্ষণে**

তোমরা যে কার্য্যের সূচনা করিবে, তাহা কালে রত্নপ্রসু হইবেই। বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয় সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলাতেই হইবে। যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় হাসিতে কাঁদিতে, চিন্তা করিতে,স্বপ্ন দেখিতে না শিখিব, যদি তাহা সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃভাষা বাঙ্গলাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা থাকিবে। কোন জাতি কেবল বিদেশী ভাষার চর্চায় কখন বড় হইতে পারে নাই। ইউরোপ যখন লাটিন ছাড়িয়া দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন ইংল্যান্ড নর্ম্মান-ফ্রেন্স ত্যাগ করিয়া তাহার এক সময়ের ঘৃণিত সাকসন ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেই দিন ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনের তথা উন্নতির সূত্রপাত হইল। যখন হইতে জার্ম্মানী ফরাসী ভাষার মোহপাশ কাটিয়া তাহারা মাতৃভাষাকে পূজার স্থান দিল তখন হইতে জার্ম্মানীর জাতীয় উন্নতির আরম্ভ হইল।

সাহিত্যের দুটি একটি শাখা বিদেশী মাটিতে টিকিতে পারে কিন্তু সমগ্র সাহিত্য বিদেশী আবহাওয়ায় সহজে বাঁচিবে না। রোমান যুগের পরবর্ত্তী কালের ইউরোপের বিপুল লাটিন সাহিত্য কোথায়? আমাদের দেশেই পাঠান ও মোগলযুগের পারসীনবীশদের সে সব কেতাব কোথায়?

কয়জন মিলটনের সেই তেজস্বিনী লাটিন কবিতা এখন পড়ে? বঙ্কিমের Rajmohan's Wife -এর কিংবা মাইকেলের The Captive Lady -র সন্ধান গ্রন্থকীট ব্যতীত এখন কে আর খোঁজ রাখে? সাহিত্য সাধনা যদি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে চাও তবে তোমাকে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সাহিত্য রচিতে হইবে।

ছাত্রগণের অনেকের বিশ্বাস অন্ততঃ কার্য্যতঃ পরিচয় পাই যেন বাঙ্গলা ভাষা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বাঙালীর আয়ত্ত হয়। যেন তাহার জন্য কোন সাধনার কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। কেবল গলার স্বর থাকিলেই কি কেহ সুগায়ক হইতে পারে ? না একটা যন্ত্র হাতের কাছে থাকিলেই ও সুবাদক হইতে পারে ? যেমন সুগায়ক সুবাদক হইতে বহু পরিশ্রম করিতে হয় তেমনি সুলেখক হইতে গেলে এই ছাত্রজীবন হইতেই রীতিমত রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। অবান্তররূপে বলিতে গেলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পর্য্যন্ত না বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজি সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবে সে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইবে না। ছাত্রগণবাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য কি করিতে পারে আমি এক্ষনে মোটামুটিভাবে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের চাই The New Oxford Dictionary-র ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত অভিধান , ইহার জন্য সমস্ত প্রাচীন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসূচি করিতে হইবে। The New Oxford Dictionary -র জন্য বহু সহস্র স্বেচ্ছা-শব্দ-সংগ্রাহক হইয়াছিল। আমাদের জন্য কি একশত স্বেচ্ছা সাহিত্যসেবক পাওয়া যাইবে না?

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কিরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙালীর জাতিতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ সাহায্য হইতে পারে।ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই আপাতনীরস কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে ? বাঙ্গালায় জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্ন স্তূপরূপে প্রাচীন মন্দির-মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে কিংবা লোকমুখে ছড়া ও কিংবদন্তীরূপে ছড়ানো রহিয়াছে। মাণিকচাঁদ রাজার গান লোকমুখ হইতেই সংগৃহিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের ভার ছাত্রগণ লইলে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা জাতীয় ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

ঠাকুরমা ও দিদিমার মুখে মুখে এখনও কত উপকথা, হিঁয়ালি মেয়েলি ব্রতকথা ও ছড়া রহিয়াছে । আধুনিক শিক্ষার কর্ম্মনাশা শক্তিতে আশঙ্কা হয় শীঘ্রই এ সমস্ত লোপ পাইবে অথচ এই সমস্ত নৃতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ সহায় । ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই কাজ করিবে ? ইউরোপের বহু স্থানে Folk-Lore society আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা দেশে ইহার আলোচনা একেবারেই নাই।

তারপর পুঁথি-সংগ্রহ ও সন্ধান। সাহিত্য-পরিষদের ও প্রাচীন সাহিত্যামোদী মহোদয়গণের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে।কিন্তু এখনও বহু পুঁথি বাঙ্গলার নিভৃত কোণে গুপ্ত রহিয়াছে । বাহিরের লোকের সপক্ষে তাহার দর্শন পাওয়া দুরে থাক সন্ধান পাওয়াই সুদুরূহ । ছাত্রগণ নিজেদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।এইরূপ বহু কাজ আছে যাহার জন্য ছাত্রসমাজের প্রয়োজন। এইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ছাত্রগণের জন্য এক বিশেষ শাখা আছে এবং তাহাদের জন্য অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতির আশা-ভরসা ছাত্রদেরই উপর। ছাত্রবন্ধুগণ তোমরা আমাদের আশা পূর্ণ করিবে? না, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতের জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে কাতরনেত্রে প্রতীক্ষা করিব? বহুকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। বলআর কত কাল ? আর কত কাল?

****

৯

-: শব্দার্থ :-

সম্মুখে = সামনে, সন্ধান = খোঁজ, সমগ্র = সম্পূর্ন, অনায়াসে = সহজেই
প্রতীক্ষা = অপেক্ষা, সুগায়ক = ভালো গায়ক, বৃহৎ = বড়, রসনা = জিহ্বা
অভিধান = শব্দকোষ, পদতলে = পায়ের নিচে, স্বেচ্ছা = নিজের ইচ্ছা,
যোগানদার = যিনি যোগান দেন, সুবর্ণ = সোনা, অবসান = শেষ,
ত্যাগ = বর্জন, সূত্রপাত = আরম্ভ , নগ্নপদ = খালিপা, পঙ্কিল = কাদাযুক্ত
আক্কেল= বিবেচনা, নিশুতি=গভীর রাত, পেশা=বৃত্তি, অস্বীকার=না মানা,

-: অনুশীলনী :-

আকলন

১) লেখ:

(অ) যাহারা আমাদের সাহিত্যের বুনিয়াদ আগেই গড়িয়া দিয়াছেন ....

(আ) কারণ লেখ :

(১) কেবল অর্থ বলে কেহ বড় হয় নাই ....

(২) সাহিত্যের উন্নতি ব্যতিরেক জাতীয় উন্নতি হয় না ....

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পরিচয় দাও :

(১) জগদীশচন্দ্র বসু । (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । (৩) কৃত্তিবাস ওঝা।

শব্দ সম্পদ

(২) (অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

উচ্চাসন,উন্নতি, বাঞ্ছিত,অনিশ্চিত,অতীত,ক্ষীন , আরম্ভ, অভ্যাস

(আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :-

দীর্ঘ , সহস্র , আশঙ্কা, কর্ণ , পরিশ্রম, সুলেখক,সমস্ত ,সংগ্রহ

(ই) নিম্নলিখিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-

বৃহৎ , গুরু , উচ্চ , ক্ষুদ্র, প্রিয়,সংগ্রহ -

অভিব্যক্তি

(৩) (অ) যে কোন সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে’- এই ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

(আ) সাহিত্য - সাধনা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন’ - এই ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

পাঠের উপর আধারিত লঘুত্তরী প্রশ্ন

(৪) (অ) মাতৃভূমির গৌরবের জন্য আমাদেরকে কী -কী করিতে হইবে ?

(আ) আমাদের সাহিত্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কী করিতে হইবে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ) (১) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের সাহিত্য চর্চার পরিচয় দাও ।

(২) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের শিক্ষা জীবন এবং কর্মজীবনের পরিচয় দাও ।

(আ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহের লেখা দুটি গ্রন্থের বা উপন্যাসের নাম লেখ ।

৯.নীলধ্বজের প্রতি জনা

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত - জন্ম ২৫শে জানুয়ারী, ১৮২৪ ,যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে। মৃত্যু ২৯শে জুন,১৮৭৩ । হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই মেধাবী ছাত্র বলে নজর কেড়েছিলেন। এই সময়েই ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বিলেত যাওয়ার ইচ্ছায় ১৮৪৩ সালে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। পরে বাংলায় সাহিত্যসৃষ্টি শুরু করলে blank verse- এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন ক'রে বাংলা কাব্যে যুগান্তর আনেন । ব্যরিস্টার হওয়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন। গ্রীক,ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্য ছিল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এছাড়া 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য','শর্মিষ্ঠা'নাটকএবং প্রহসন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' তাঁর বিখ্যাত রচনা।নীচের অংশটি অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে নেওয়া হয়েছে ।

-:কবিতার মূল কথা:-

মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর যজ্ঞের ঘোড়া আটক করলে পার্থ তাকে যুদ্ধে হত্যা করেন। পুত্র শোকে কাতর রাজমাতা জনা কল্পনা করেন, যেহেতু রাজতোরণে রণবাদ্য বাজছে,রনক্ষেত্রে মেতে উঠেছে রাজসৈন্য, তাই রাজা নীলধ্বজ নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিচ্ছেন পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার। খুব তাড়াতাড়ি রানী জনা বুঝতে পারেন যে রাজা নীলধ্বজ পুত্রহন্তা পার্থকে বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছেন।}

একাদশ সর্গ

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,-পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন । নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন ।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ! মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ! -কিন্তু কোন হেতু?
সাজিছ কি,নররাজ, যুঝিতে সদলে -
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,-
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু ! যাও বেগে গজরাজ যথা

যমদন্ডসম শুন্ড আস্ফালি-নিনাদে!
টুট কিরীটির গর্ব্ব আজি রণস্থলে !
খন্ডমুন্ড তার আন শুলদন্ড - শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ।
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে ।
জন্মে মৃত্যু, -বিধাতার এ বিধি জগতে ।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,-
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু-মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে !-
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব
কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোর কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নৃমণি ?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম
অসি ?

না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্নতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে , কহ,-
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,- কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ন জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে; - এ কি
ভ্রান্তি তব ?
জানি আমি কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ । মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে ।-
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে । যথাসাধ্য কে বুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল
দহিল খাণ্ডব দুষ্টে কৃষ্ণের সহায়ে ।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী ! দ্রোণাচার্য্য গুরু,-
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি ! বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ন মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে, কহ মোর, শুনি,
মহারথী-প্রথা কই হে এই, মহারথী?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্র কৌশলে!-
বধে ভীরুচিত ব্যাধ, সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে !
কি না তুমি জান রাজা ? কি কব
তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, -হে বিধাতঃ ! - পার্থের
সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু

দাবানলে ? কোকিলের কাকলী লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা । গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে ।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয়-যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?

হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে !
হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন, নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে ? কোন্ জন্মে কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই রে
ছিঁড়িলি !-
হা পুত্র ! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কি রে ছিল তোর্
মনে ?-
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে
তোরে ?

(সংক্ষেপিত)

****

-: শব্দার্থ :-

বিষম	=	দুঃসহ	রিপু	=	শত্রু
তৃন	=	ঘাস	কর্ণ	=	কান
তনয়	=	পুত্র	মান	=	মর্যাদা
ইন্দিরা	=	লক্ষ্মী	বসুন্ধরা	=	পৃথিবী
পার্থ	=	অর্জুন	নাথ	=	স্বামী

অনুশীলনী

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

অ) ছক পূর্ণ করো :

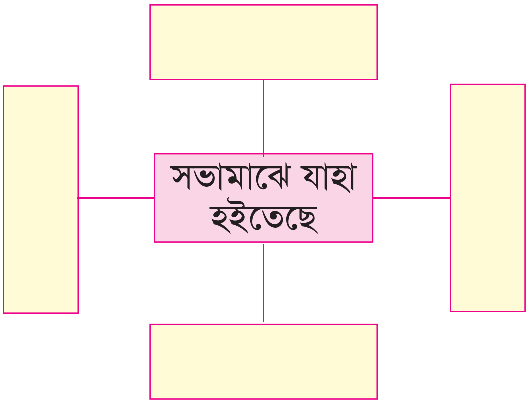

আ) কারণ লেখ :-

(১) কুরুক্ষেত্রে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ - ....

(২) পার্থ খাণ্ডব দাহনে সফল হওয়ার কারণ - ....

(৩) জনা তার স্বামীকে অভিশাপ দিয়েছেন তার কারণ - ....

কাব্যসৌন্দর্য

২) (অ) অর্জুনের কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত যে পঙক্তিগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, তার যে কোন একটি পঙক্তির উল্লেখপূর্বক অর্থ লেখ ।

(আ) ১) জনার পুত্রের নাম কি ?

(১) অভিমন্যু (২) প্রবীর (৩) কুশ

২) পার্থ কে ?

(১) শ্রীকৃষ্ণ (২) অর্জুন (৩) প্রবীর

অভিব্যক্তি

৩) (অ) 'মা এবং মাতৃভূমির স্থান স্বর্গেরও উপরে' - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

(আ) সৈনিক ভাইদের প্রতি শ্রদ্ধা মনোভাব রাখা উচিৎ এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

রসাস্বাদন

৪) জনার পত্রে তার ক্রুদ্ধ অভিমানী স্বর কী ভাবে ধরা পড়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

অ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ করো :-

১) 'যম দন্ডসম শুন্ড আস্ফালি নিনাদে !'

২) ' হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে ;

আ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুটি কাব্য গ্রন্থের নাম লেখ ।

কাব্যরস

কাব্যরসের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। রসকে কাব্যের প্রাণ মানা হয়, রসের মাধ্যমেই কাব্যে ভাব নির্মিতি হয়। বাংলা সাহিত্যে কাব্যরস ১০ প্রকার। যথা:- ১) আদি ২) বীর ৩) করুণ ৪)অদ্ভুত ৫)হাস্য ৬) ভয়ানক ৭) বীভৎস ৮) রৌদ্র ৯) শান্ত এবং ১০) বাৎসল্য।

১) আদিরস :- নায়ক - নায়িকার অনুরাগ বিষয়ক ভাবকে আদিরস বলে ।
যথা :- সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে-
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।

২) বীররস :- দয়া, ধর্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রাম বিষয়ে উৎসাহ বিষায়ক ভাবের নাম বীররস।
যথা:- দুর্গম গিরি, কান্তারমরু, দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি - নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

৩) করুণরস:- ইষ্ট বিয়োগ বা অপ্রিয় সংযোগে যে শোকসঞ্চার হয় তাকে করুণরস বলে।
যথা:- দিদির মত ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন ক'রে রবে?
আমিও নাই-দিদিও নাই- কেমন মজা হবে?

৪) অদ্ভুতরস:- আশ্চর্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিষ্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয় তাকে অদ্ভুতরস বলে।
যথা:- ১৯৪০
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধস্বদেশ ভূমি।

৫) হাস্যরস :- বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয় তা হাস্যরস নামে পরিচিত।
যথা :- মজার দেশের মজার কথা,
বলব কতো আর
চোখ মেললে যায় না দেখা,
বুঝলে পরিষ্কার।

****

১০.গালিলিও

- সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ বসু- জন্ম ১-লা জানুয়ারি, ১৮৯৪,কলকতা; মৃত্যু ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪। বিশ্ববিখ্যাতপদার্থতত্ত্ববিদ। পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে । আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সংযোগে উদ্ভূত হয়েছে 'বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স।'পদ্মবিভূষণ সম্মান লাভ করেছেন। সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন । এই রচনাটি তারই এক নজির ।

:পাঠের মূলকথা:-

গালিলিও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে গান, চিত্রকলা তার পছন্দ ছিল। ঘটনাক্রমে গালিলিও গণিত শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। ছোট বেলা থেকেই গালিলিওর হাতে কলমে কাজ করার প্রবণতা ছিল। দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন গালিলিও। তার তৈরি সেই যন্ত্র দিয়ে আকাশের অনেক কিছুই নিরীক্ষণ করা হয়েছিল। পোপ এবং ধর্ম যাজকদের ষড়যন্ত্রের ফলে তার কাজের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। এমনকি তাকে অনেক শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল।

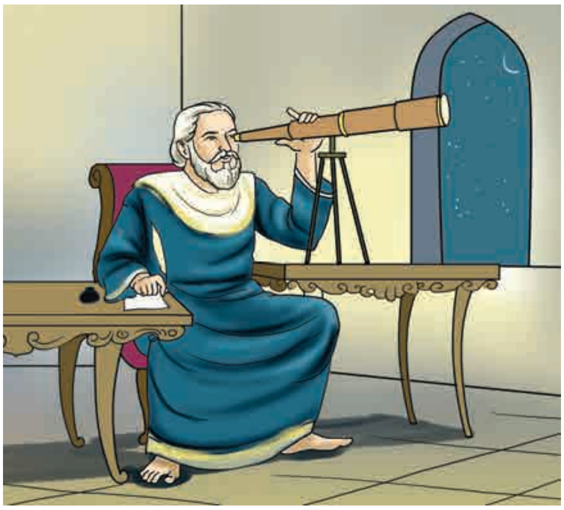

১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৫৬৪ গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন । সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত । তাঁর জন্মের চার-শ বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে ।

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই । পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল - নিজে Lute ভাল বাজাতে পারতেন । সঙ্গীত তত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি । প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallambrosa-র বেনেডিকটিন(Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে ।দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হলো। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশী পড়াশুনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়তো মনে মনে একটু ভয়ও ছিল–ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়–সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। স্বচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে

ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুস্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালবাসতেন সঙ্গীত ও চিত্রকলা । নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়তো শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হলোনা। ১৫৮১ সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে দর্শন পড়তে হতো। তখন অ্যারিষ্টটলীয় যুগ–সেই গ্রীক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সুরু হতো ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে।গালিলিওর ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতে-কলমে করে দেখতে–তাই তর্ক লাগতো অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। কখনও কখনও শিক্ষকদের সঙ্গেও বেধে যেত বাক্ যুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ করবার জিনিস–এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হলো। এই কাজ-পাগল কি করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকলো? গল্প এই–পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়–সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোন কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়ীতে। তাসকনীর (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে সুরু হলো মনের প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারী পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠলো, গালিলিওর ডাক্তারী পড়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি আর পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এলো। বাবার অর্থ সামর্থ্য নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে সুরু করলেন–গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে ফেলে গেলেন অনেক পেছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এলো–নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও সুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হতো সে সময়। তবে ১৫৮৮ সালে দেখি, 'পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র ৬০ Scudi একজন হিসাব করে বলেছেন–বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মত ইটালীতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন ১৫৯১ সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হলো–মা, দুই বোন। ছোট ভাই মাইকেল এনজেলো। (Michael- Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোলাণ্ডে রাজদরবারে কলাবিদ হলেন। বাড়ীতে ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলে-মেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হতো। এই জন্য সারাজীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব,পরের কথা ভাবছেন অপরদিকে চাইছেন, কি করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারী করছেন–ছুটোছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন। যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারাজীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পী মন ওই মহিমময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশী আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনটন বাড়লো। তখন ১৫৯২ সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

মাতৃভূমি তাস্কানী ছেড়ে। এখানেই শুরু হলো তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়লো খুব বেশী–বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই , তাছাড়া দেশ রক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo) তাঁর প্রিয় ছাত্র। তার মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে-রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে তাও করতেন গালিলিও সময় সময় । যদিও এতে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী।

অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমীর যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহনক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে–এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালিলিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাডুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন–কোপারনিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা। দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুশী। ১৬০৪ সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়লো শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানালো না ।১৬০৯ সালে ঘটলো এক নতুন ব্যাপার-হল্যান্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দুদেখায়–মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছালো। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হলো। তিনিও দূরবীণ তৈরি করতে পারলেন–এটি আরও ভাল ও শক্তিশালী হলো । হল্যান্ডে লোকটি দেখছিল–সব উল্টো দেখায় তাঁর দুরবীণে। গালিলিও করলেন যে যন্ত্র , তার সাহায্যে সব জিনিস যথারীতি অবস্থিত দেখায়, দূরের জিনিস এভাবে বড় উল্টোপাল্টা হয় না। Venice-একর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে–বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত তখন Venice শহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হতো। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন–এই দূরবীণ সব জাহাজেই বসাতে হবে।

গালিলিওর উপর ভার পড়লো দূরবীণ যোগান দেবার। গালিলিও রাজি হলেন–বাড়ী হয়ে উঠলো ফ্যাকটরী কারুশালা।সেখান থেকেপ্রচুর দুরবীণ বিক্রী হতে লাগলো। তৈরির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হলো। নতুনগুলি হলো আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এসব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়লো, আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ , ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

তাঁরা ভাবলেন-এইভাবে কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবীণের মধ্যে কোন যাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে , যা চোখে দেখা যায় না–তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজী। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবীণের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগলো। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবীণের ব্যবহার করতে চান নি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন,

মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন–হয়তো এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত হচ্ছে । Venice-এর রাজ সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে- নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান, কিন্তু সময় পান না একাগ্র মনে এই সব বিষয় ভাবতে অথচ সংসারে তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । তাই ১৬০৯ সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তার ছাত্র Cosmo সেই গদিতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো এর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোন অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হলো: "এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশী অবসর পাবো নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাডুয়া ছাড়া অন্য কোন শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ অবসর না পেলে কাজও এগোবে না। ভিনিসে গণতন্ত্র–যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে–যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না; অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকুল্য আমি চাইছি, সে কোন একদেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব ।"

আবার অন্যত্র লিখেছেন –" রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশী পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারবো।"এক বৎসর ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষে ১৬১০ সালে শরৎকালে Tuscany-এর নতুন Grand Duke নিজের পুরনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন –১০০০ Scudi মাইনে প্রতি বৎসর । তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি । পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিললো। তবে যে সব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হৈ চৈ বেধে গেল। অনেকে তার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তার সব আবিষ্কারও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইলো না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্য গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতীমহলে চালু latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন-নিজের আবিষ্কারও মতবাদ – ইটালীয়ান ভাষায়। ইটালীর মধ্যে যাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। ১৬১২ সালের মে মাসে তিনি চিঠিতে লিখলেন : "আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে - হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু–যাহোক একটা উপাধি হলেই হলো । তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু । এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না । এরা মেধাবী, কিন্তু তাঁরা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না । তাই সারাজীবন তাঁদের মনে এই ধারণা বদ্ধমুল থেকে যায় যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামুল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাঁদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তার মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে ।"

নিজের দূরবীণ নিয়ে গালিলিও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন । চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মত ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি,

শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিস। এই ভাবে নিজের চোখে গ্রহমন্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দূরবীণের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হলো । যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এই সব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যারা এই সব নতুন মত মানতে পারলেন না কিংবা যারা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন, এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়লো। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী , বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন–গালিলিও ধর্ম - বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করলো। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র স্বরূপ– এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী - কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন– "পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ১৬১৬ সালে মার্চ মাসে কোপারনিকাসের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারিমিন যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন–তিনি যেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা

যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমত তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার বা আলাচোনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। ১৬১৬ সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়লো। বেলারিমিন ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্খী ও সুহৃদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই । তাই কার্ডিনাল বেলারিমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে।

বুঝিয়ে বললেন–কোপারনিকাসের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মত ও তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজী হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাসের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তিতর্ক দিয়ে টলেমী ও কোপারনিকাসের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তার পরও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য–সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারিমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত ।

এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন - ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হলো হিতে বিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন । তাঁর বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ।শেষে গালিলিওর ডাক পড়লো–১২ই এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০শে এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হলো যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন–সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন। তার নির্যাতনের এইখানেই শেষ হলো না। তার মুখ দিয়ে বলানো হলো যে, তিনি কোপারনিকাসের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপব্যঞ্জক সাদা পোষাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন–"তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে । আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।"এর দু'দিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন । প্রথমে তাকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop - এর নজরবন্দী করে রাখা হলো । তারপর ফ্লোরেন্সের শহরতলীতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটলো। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করতো এই দুঃখকষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। নিজে অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হলো–কিছুটা বাধানিষেধের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়–নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসতো, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খৃষ্টীয় মহলে, যারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ই জানুয়ারী ১৬৪২ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করালেন ।প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাড়িয়ে উঠলেন-তখন নাকি তিনি বলেছিলেন– "এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।" কিন্তু এটা হয়তো গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি । ফলে ইটালী দেশই পিছিয়ে পড়লো । ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করলো ।গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্তমতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন । বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে–শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে । ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইলো না। চার শত বৎসর বাদেও তাঁর প্রতি নানা লোকের ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে । 'সত্যমেব জয়তে ।'

-: শব্দার্থ :-

কৃতবিদ্য = সুশিক্ষিত, অনটন = অভাব, মঠ = সন্ন্যাসীদের আশ্রম,

অবসর = বিশ্রাম, বিপুল = অনেক, বক্তৃতা = ভাষন, সামর্থ্য = ক্ষমতা

পন্থা = উপায়, সুহৃদ = বন্ধু, উদ্ভাবন = নতুন আবিষ্কার, ষড়যন্ত্র = চক্রান্ত

-: অনুশীলনী :-

আকলন

১) লেখ:

(অ) গালিলিও নিজে খুবই ভালো বাসতেন

(আ) কারণ লেখ :

(১) গালিলিও কে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হলো ....

(২) গালিলিওর গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠলো ....

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও :

(১) গালিলিও (২) কোপারনিকাস (৩) মাইকেল এনজেলো

শব্দ সম্পদ

(২) (অ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

স্বপক্ষে,অল্প,ছোট,শেষ,শক্ত,আনন্দ,বিশ্বাস,কেনা

(আ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :

সম্পদ হারা,জাগরন,একনিষ্ঠ,সঠিক,আবিষ্কার,প্রতিকূল,ঘোরা,সাধু,চন্দ্র,মূর্খতা

অভিব্যক্তি

(৩) (অ) বিজ্ঞানীর জীবনী পাঠের প্রয়োজন' এই ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো :-

(আ) অন্ধ বিশ্বাস দূরীকরনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন -এ তোমার মতামত ব্যক্ত করো :-

পাঠের উপর আধারিত লঘুত্তরী প্রশ্ন

(৪) (অ) গালিলিও কে ডাক্তারি পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কেন তাহা আলোচনা করো ।

(আ) ধর্মযাজকরা গালিলিওর বিরুদ্ধে কী প্রচার করতে লাগলেন তাহা আলোচনা করো ।

(ই) দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কারের সূত্রপাত কী ভাবে হয়েছিল তাহা আলোচনা করো ।

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ) সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় দাও ।

(আ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছাত্র জীবনে লেখা পড়া ছাড়াও যে বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন ।

****

১১. তালাক

মহাশ্বেতা দেবী

-:লেখিকার পরিচিতি:-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় মামার বাড়িতে মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম। পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক মনীশ ঘটক, মাতা ধরিত্রী দেবী। মহাশ্বেতা দেবী নয় ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়ো। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। তার পর ঢাকার ইডেন স্কুলের মন্টেসরি বিভাগে। পরে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চলে যান শান্তিনিকেতনে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় থেকে। পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হন। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ "ঝাঁসির রানী" ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার মুদ্রিত প্রথম উপন্যাস " নটী" (১৯৫৭) প্রথম গল্পগ্রন্থ "কি বসন্তে কি শরতে" প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে।

-:পাঠের মূলকথা:-

সমাজের সাধারন মেহনতী, খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। তারমধ্যে কুলসম, আরশাদের জীবনের আশা-নিরাশার কথাও বলা হয়েছে আরশাদও কুলসম তার সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর ও অনেক চেষ্টা করেছে।

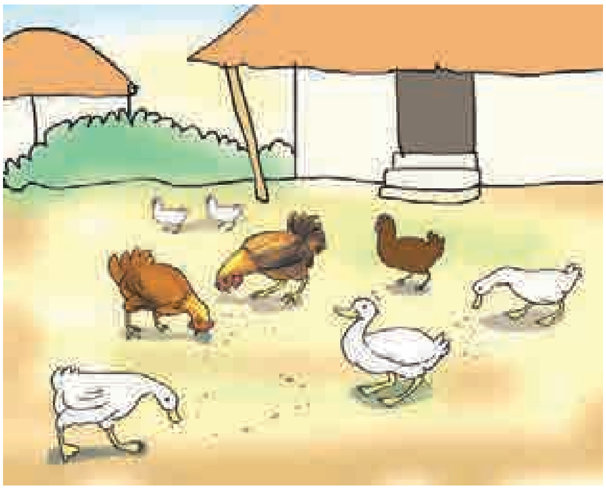

কুলসমের শাদিয়ার পর কুলসম বাপকে বলেছিল, 'কী দেখেছিলে বলতে পারো ? জমি নি, জিরেত নি,আঁস মুরগি, কিছু নি ? না কি তোমার ঘরে পুষ্যি নি,তাই পুষতে সাধ হইছিল?'

কিন্তু কুলসম পরে বুঝেছিল আরশাদ মানুষটা ভারী ঠান্ডা। 'নিনু' হয়ে থাকতে জানে। কুলসমকে ও বলেছিল, তোর বাপে টাকা দিবে যি? মুরগি পেল্যে ডিম বেচলে পেট চলে না?' কুলসমের বাপ টাকা দিয়েছিল মেয়ের হাতে।

মুরগি পেলে হাঁস পেলে ডিম বেচে কুলসম যা পেত হাতে রাখত। আরশাদ শরীরে খাটত ভূতের মত। ডায়মন্ডহারবারে ডিম মুরগি বেচে যা পেত সব বউকে দিত। তখন কুলসমের মনে আর দুঃখ ছিলনা। বড়বোনের মতো ওর পানের বরজ নেই, ছোটোটার মতো তিনখানা লাঙল। কিন্তু শান্তি ছিল,সুখছিল।

কুলসমকে আরশাদ সরম খুইয়ে গোবর কুড়োতে,জ্বালানি আনতে বলেনি কোনদিন। জীবনে কুলসম দোকান থেকে সওদা আনে নি। সবাই হিংসে করত কুলসমকে।ওর বাপ গনু এসে মাঝে মাঝেই মেয়ের কাছে দু-একদিন থাকতো।বলত, 'হেথা বড় শান্তি মা! ফুলি-দুলির সোমসারে পয়সা বেস্তর, কেচাকেচিও খুব'।

সেই শান্তি অনেক, অনেক দিন ছিল। কুলসমের ছেলে স্কুলে পড়ল, জাহাজে কাজ পেল। বিয়ে হল ছেলের। ছেলে গেল খিদিরপুরে। সবাই বলত, চাবলের গনু তিনটে মেয়ের বিয়ে তিনোরকম দিইছিল, তা কুলি

জেয়াদা সুখ পেল। দেকো, ছেলেটা অব্দি কেমন দাঁইড়ে গেল। হবে নে কেন তাই বলো? বাপ যেয়ে ছেলের স্কুলে দে আসত, নে আসত। নিজে জানে না কিছু, কিন্তু পিত্যহ সপ পেতে ললটন জ্বেলে ছেলেরে পড়তে বসাত। কুলির ভাগ্য ভালো।

সবাই বলে কুলির ভাগ্য ভালো।কুলি ছেলের টাকা মাটির নীচে পেতলের বোগনোয় জমায়, নিজে ডিম বেঁচে সংসার চালায়। এই বর্ষার আগেই কুলি ঘর ছাইবে অনেক খানা ঘর তুলবে, কিন্তু হঠাৎ ওর সুখ স্বপ্নে মাটি পড়লো। যে দিন আরশাদ ওকে পাড়াপড়শির সামনে তিন তালাক দিল এই আরশাদই বলত, 'নিনু হয়ে থাকতে পারো না? এট্টা না এট্টা কতা বলতেই হবে। এট্টা কথা হতে ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি হয়, এট্টা কাটি হতে পেলয় অগ্নি জ্বলে যায়, ঝানো না?

সেই আরশদই, নাতির অসুখে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখাবে, না বড় ডাক্তার তাই নিয়ে কুলির সঙ্গে তুলকালাম বাধল। কুলি বলল, ' হেথা এয়েছে, নেতাই ডাক্তার সুমলে দিক। তা বাদে ওরা ঝেয়ে কলকেতায় বড় ডাক্তার দেকাবে?'

কুলির বউ আরসাদের চাচাতো ভাইয়েরই মেয়ে। বউয়ের বাপ বলল, ' কেন? তোমাদের অযচ্ছল রইতে নেতাই ডাক্তার কেন? আরশাদ বলল, উ মাগীর কতা আমি শুনি না। আমার অক্তের অক্ত। ওরে আমি ডায়মনহারবার নেযাব।'কুলি বলল, ' অযচ্ছল পয়সা তোমার তাই না?'আরশাদ বলল,' কার তরে টাকা পুঁতেছিস ঘরে?''তোমার নাতির তরে গাই গরু কিনব বলেনি?''জান আগে না দুধের বেবস্থা আগে?''তুমি নে ঝেয়ে দেকাও, যদি টাকা থাকে?'' তোর টাকা, তাই গরম হয়েছে?''ঝদি তাই হয় মড়াখেগো?

আরশাদ রাগে অন্ধ হয়ে চেঁচাতে শুরু করল। কুলি ও চেঁচিয়ে পাড়া প্রতিবেশী জমিয়ে ফেলল। তখন আরশাদ সদর্পে বলল, 'ঝা, তোরে আমি তালাক দিলাম।' 'তালাক দিলে?'' দিলাম।' আরশাদ চেঁচিয়ে বলল,'তালাক! তালাক! তালাক!'' ই তুমি কী করলে গো ? কুলি মূর্ছাগেল।

মূর্ছা ভাঙল, অভিমান আর ভাঙে না কুলির।

রইল যথাসব্বস্ব বলে কুলি পেতলের বোগনো থেকে চারশো টাকা নিয়ে সোনার পেটি রুপোর গোট নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে ধবধবিতে বড়ো বোন ফুলির বাড়ি গিয়ে উঠল। বলল, ' ঝেথা চোক যায় চলে ঝাব । ছেলে এসে বেবস্থা করুক? উ মড়াখেগোর মুক দেকব না আমি।' ফুলি বলল, " তোর আড়াই কুড়ি বয়স হলো, ' ওর বয়স কোন না তিন কুড়ির কাচে হবে? কোথা ঝাবি বল? হেতা থাক। তোর হাতে টাকা পয়সা আছে, ভাবনা কী তোর?' কুলি বলল, ' এমন নেমকহারাম হতে আছে? আতকানা, তুমি চক্কে দেক না। লালটেম নে আমি দাঁইড়ে থাকি, তুমি বোনাইবাড়ি থে আসবে বলে? পুরু ক্যাঁতা পেতে শুতে ভালোবাস,কাপড় না ছিড়তে আমি ক্যাঁতা করে দিই। দাওয়া বাঁদি, উটোনে শাকলঙ্কা আবজাই, লঙ্কা বিনে খেতে পারো না। সেবার মিটিকেলে পাইটে তোমারে নতুন চশমা কইরে দিনু। সে তুমি টেনে খুইয়ে এলে। ফের করে দিতু এবারে? কী জন্যি তালাক দিলে? নাতির জন্যি? ছোটছেলের কাশি হয় নে? জ্বর হয় নে? নেতাই ডাক্তারের চিকিচ্ছেয় মোর সান্নিপাতি অব্দি সেরে যায় সিবারে, তা বলার অসুক সারত নে? উ ভাবিসনি একন।'

ফুলি নিজের কাজে গেল। মনে বড়ো সুখ ওর। দুটো সতীন নিয়ে ঘর করে ফুলি।স্বামীর সঙ্গে নিয়ত ঝগড়া হয় ওর । কুলির স্বামিভাগ্যকে চিরকাল হিংসে করেছে ফুলি । এক বুক সুখ নিয়ে ফুলি গিয়ে ছোট ছেলেকে বলল , ' ছিপ ফেলগা যা। উ মাছ ভিন্ন খায় না । আর দেখ, উর কাচে কাচে রইবি । তেমন বুজলে বলবি, এট্টা ছাতা কিনে দেবে? বড়োবোনের বাড়ি থাকতে থাকতেই কুলি খবর পেল আরশাদের সেই চাচাতো ভাই এসে বাড়িতে উঠেছে। এখন দহরম মহরম

খুব। নিয়ত মুরগি রান্না হচ্ছে। কুলির ছেলে ছুটি নিয়ে এখনও আসেনি।ফুলি বলল, ‘ কত সাদের সোমসার তোর! তা পরের ভোগে গেল? নিশ্চয় তোর অজানতে গোনা হইছিল কিছু? নালে আল্লা এমন শাস্তি তোরে দেলে কেন?

কুলি ফুলিকে দশকথা শুনিয়ে ছোট বোনের বাড়ি গেল। বোন বোনাই বলল ‘ চেরকাল থাকো না কেন? হাতে টাকা আইতে তোমার ভাবনা কী বল? আবার হাঁস মুরগি কেন, একখানা ঘর তোলো? ‘সোমসারে থুতু ফেলেছি, ফিরে গিলব না। বলে কুলি গুম হয়ে বসে রইল। বুকে যেন কুল কাঠের আংরা জ্বলে। তিলে তিলে গড়া সংসার পেছনে ফেলে আবার কি সেইসব কাজ করতে পারে কুলি? ধান কলিয়ে গেলে সেদ্ধ করে হাঁসকে খাওয়াতে পারে? নিমনিমে সন্ধ্যায় নতুন করে আয় তি-তি-তি বলে হাঁস-মুরগি তুলতে পারে ঘরে? ছেলে এসে বলল, ‘ তুমি হোথা চলো মা। সব ঝানি ভেসে গেল।ঝাব কি পর পুরুষের সঙ্গে আইতে? তোর বাপ একন পরপুরুষ না? বাপ বলে......’ ‘ কি বলে? ঝা হয়েছে তা হয়েছে। এর রূপায় হয়, তাই বলছিল । তা ভিন্ন......’ কী ?’ ‘বাপ ভাতজল মুকে দেয় নে। দিনরাত কানতেছে। বলে এ আমি কী কন্নু।’ কুলির মনে বিজাতীয় আনন্দ হল। আর কি বলে?’ ‘ঝার জন্যি বেঁচে জীয়ে আছি, তারেই তালাক দেলাম। বউয়ের নানা বলে রূপায় হয়।‘কি রূপায়? ছেলে পা দিয়ে মাটি খুঁড়ল। বলল, ‘সে তারা বলবে।’ তারা সবাই এলো দুলির বাড়ি। কুলির টাকায় পাঁচজন চা-পান বিস্কুট খেলা। বউয়ের দাদু প্রবীণ, বিজ্ঞ, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সবাই তাঁকে মানে। কুলি ঘরের ভেতর থেকে শুনতে লাগলো সব। গলা খাঁকরে বউয়ের দাদু বললেন, ‘ হারা, তো মা কি সোমসার চায়? সোয়ামি চায় ? কুলির চোখে জল এলো। হারা বলল, নিছয়।‘তবে আর কী। ক কুড়ি টাকার মামলা।’ আবার নিকে বসুক কুলসম। গাঁয়ের ইরফান মন্ডল রাজি আছে। বসবাসের ক রাত কাটলে ফের ইরফান কুলিকে তালাক দেবে । তখন আরশাদ তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে ঘরে। কুলি শুনে ছি ছি ছি করে উঠলো। পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে একবার অন্য কারো দিকে চাইনি কুলি। ছেলে কে সামনে রেখে বোনাইদের ভাত দিয়েছে। আজ, এই বয়সে,সাতাশ বছরের ছেলের সামনে সে এই কাজ করবে?

তবে যাও মর গা।’বলে পাঁচজন রেগে চলে গেল।আরশাদ পরদিন কাঁদতে কাঁদতে এল। বলল, ‘ তারে বল ফুলি এ না হলি গোনা হয়। নইলে আমি এমন কথায় সায় দিই ?’ আ গো , সি শোনে না পাঁচ জনের কতা । ‘ বলোগা, আমি আপ্তঘাতী হব। ফলিডল খাব।’ কুলি ঘর থেকে ডেকে বলল, ‘ দুলি, বলগা যেয়ে, যি মনিষ মোরে সওদা করতে দেত না, পতে বেরোতে দেয় নে, সি মোরে ই কথা বলে কী করে। কাঁদতে কাঁদতে আরশাদ চলে গেল। কদিন বাদে খবর এল, সব বেচেবুচে দিয়ে আরশাদ ফকির হয়ে যাচ্ছে। হাঁস - মুরগি, ঘরটুকু, সব নিতাই ডাক্তার পাঁচশো টাকায় কিনে নিয়েছে।কুলি দিনেমানে চুপ করে রইল। তার পর বলল, ‘ হাতের পেটো, উপোর , গোটবিচে, সব্বস্ব থুয়ে এসেছিনু দুলি । সজনা তলায় পুঁতে একেছিনু। নে আসি।’ ‘ হারার বাপ ঘরে অইতে ঝাবি? ‘ ঝাব আর এসব। নেতাই ডাক্তারের ঘরে মোরে যেতে দেবে কেন?’ দুলি আর বোনাই চোখে চোখে হাসল। সব এখন তাদের না হোক কিছু কিছু তো হবে? ‘একা ঝাবি? ‘বুড়ো হইছি। ভয়টা কী? রাতেভিতে পাঁচ মাইল হেঁটে বাড়ি এল কুলি। সব সুনসান । সপ পেতে শুয়ে ছিল আরশাদ। কুলি ওর গায়ের কাছে মাটিতে পা ঠুকল। বউ আলি?’ ‘মর মড়াখেগো । আমি তোর বউ কিসে রে! শোন, আমার পেটকাপড়ে সব্বস্ব টাকা গয়না।

দুলিরে ধোঁকা দে চলে এইছি। চল রাতেভিতে চলে ঝাই দুজনা? কেমন করে? ‘ এলে চেপে? সি বারে দেকে আসিনি সব? কলকাতা ঝাব, বেকবাগানে অইব। ঘর নেব। তুমি একদিকে থাকবা আমি একদিকে অইব। নয় কাজ করব? নয় তুমি বিড়ি বাঁধবা ? আমি তোমার ভাত ফুইটে দেব। তুমি নামিয়ে নেবা । কোনো গোনা থাকবে না। ‘ এক ঘরে যে?’‘ মোরে হেঁপা উগি এরফানের ঘরে ঠেলে ছিলে, ই তা হতে ভালো নয় ? ‘ হারা কী বলবে?’ ‘ ঝা মনে হয় তা বলবে। বলব মোরা স্তি-পুরুষের মতো অই না বাপ। বুড়ো হইচি ই এট্টা অব্যেস , তাই গোনা করিছি বল করিছি। ‘মানুষ, জানলি ?’ ‘ঝা মনে তা বলবে। লাও,ওটো।’ রাতে ওরা দুজনে চোরের মত রেলস্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। কাল ঢি- ঢি পড়বে গ্রামে। সবাই ছি-ছি করবে। কিছু ভাবলো না কুলি। আরশাদ বলল, দেকতে পাই না যি? হাতটা ধর তুই। লাটিগাচা দাও, এক মুড়ো ধরতেছি। একন আমি তোমার হাত ধরতে পারি? দেকে পা ফেলো । আলে হোঁটচ খাবে।’

****

-: শব্দার্থ :-

সরম = লজ্জা   সোমসার = সংসার   জান = প্রান   অগ্নি = আগুন

যথাসর্বস্ব = সবকিছু   অপ্তঘাতি = আত্মহত্যা   শাস্তি = সাজা   কেচাকেচি = কলহ

চুপ = শান্ত   পালা = পোষা   অব্দি = পর্যন্ত   বেস্তর = অনেক   বেচা = বিক্রি

অনুশীলনী

আকলন

১) লেখ :-

(অ) কুলসমকে, আরশাদ যে কাজ কখনও করতে বলেনি ....

(আ) কারন লেখ :-

(১) কুলসমের ছেলে জাহাজে কাজ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ....

(২) কুলসমের সংসারে সুখ - শান্তি ছিল ।

(ই) নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও :

(১) আরশাদ (২) কুলসম

শব্দ সম্পদ

(২) অ) নিম্ন শব্দ গুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

শুরু, চোর,শান্তি,দিন,সন্ধ্যা,আনন্দ, ভাঙ্গা,রাজি,

(আ) নিম্ন শব্দগুলির সমানার্থক শব্দ লেখ :-

বেশী, বৃদ্ধ,বিক্রি,বৈদ্য,অহংকার,নিস্তব্ধ,ঈর্ষা,সবকিছু,

(ই) নিম্ন শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-

দুঃখ, দোষ,দিন,জরা,মরন,লোক,অক্ষম,শরীর

অভিব্যক্তি

(৩) (অ) ‘পন প্রথা’ -একটি সামাজিক কলঙ্ক -এই ব্যাপারে নিজের অভিমত ব্যক্ত করো ।

(আ) ‘স্ত্রী-পুরুষ’ সমানতার দাবিটা আরও প্রবল হোক এই ব্যাপারে নিজের অভিমত ব্যক্ত কর ।

পাঠের উপর আধারিত লঘুওরী প্রশ্ন

(৪) (অ) আরশাদ কুলসম কে তলাক দিয়াছিল কেন ?

(আ) কুলসমের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর আরশাদের কী অবস্থা হয়েছিলো ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

(৫) বিবরণ দাও : (পরিচয় দাও)

(অ) (১) মহাশ্বেতা দেবীর শিক্ষা জীবন এবং কর্মজীবনের পরিচয় দাও ।

(২) মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য চর্চার পরিচয় দাও ।

(৩) মহাশ্বেতা দেবীর রচিত গল্পগ্রন্থ এবং উপন্যাসের তালিকা তৈরি করো
‘নটী’,’কি বসন্ত,কি শরতে’,’এতটুকু আশা’,’পলাতক’,আধার-মানিক’,
অনবরত’,বেহুলা’ ‘মায়ের মূর্তি’,গ্রাম-বাংলা’,’নৈঋতে মেঘে’)

****

আগামী পৃথিবীর জন্য

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন । জন্ম বাংলাদেশে হলেও তিনি বড় হয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে । তিনি পড়াশুনা করেছেন কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক । বন্ধুরা যখন সিনেমা দেখত, বিড়ি ফুঁকত, সুনীল তখন পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে দুপুরে কবিতা অনুবাদ করতেন । অনুবাদ একঘেয়ে হয়ে উঠলে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করেন । নীললোহিত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন । যেমন - 'পূর্ব-পশ্চিম', 'সেই সময়', প্রথম আলো, তুমি কে ? জীবন যেরকম , প্রভৃতি । তাঁর অনেক কবিতাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি করেছে । তাঁর অনেক নাটকও রয়েছে। ২৩ অক্টোবর ২০১২ সালে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।

-: কবিতার মূল কথা :-

বর্তমান পৃথিবীতে যে ভাবে বিভিন্ন প্রকারের দূষন প্রক্রিয়া চলছে তাতে বেশ কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। তবেই আমরা আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর স্বপ্নময় পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারব।

আমরা জানি না
এক শতাব্দী পরেও এ-পৃথিবী বেঁচে থাকবে কিনা
আমরা জানি না
মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে কিনা শেষতম জীবন
আমরা জানি না
সমস্ত সীমাই একদিন হবে কিনা হিরোসিমা
আমরা জানি না
হিমালয় আবার ডুব দেবে কিনা টেথিস সাগরে
আমরা জানি না

আমাদের সকলেরই নখ হয়ে যাবে কিনা ধারালো ছুরি
আমরা জানি না
ভালোবাসার কথা শুনলেই সবাই বধির ও অন্ধ হয়ে যাবে কিনা
আমরা জানি না
মুক্তি শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কিনা ইতিহাসের পাতায়
আমরা জানি না
ইতিহাস রচনার জন্য থাকবে কিনা কোনো ঐতিহাসিক
আমরা জানি না
একদিন শেষ হয়ে যাবে কিনা সব প্রশ্ন
তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাব
আমরা আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাবো আমাদের ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো অন্তত একটি স্বপ্নের উপহার।

****

-: শব্দার্থ :-

শতাব্দী = শত বৎসর কাল, ঐতিহাসিক = ইতিহাস জানে যে,
সীমা = প্রান্ত, ধারালো = শানিত মুক্তি = নিস্তার, প্লাবন = বন্যা,

অনুশীলনী

আকলন

১) নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করো :-

(অ) ছক পূর্ণ করো :-

আ) কারণ লেখ :-

(১) হিমালয় আবার ডুব দিতেও পারে টেথিস সাগরে - ....

(২) আমাদের সকলেরই নখ হলেও হতে পারে ধারালো ছুরি -.......

(৩) সমস্ত সীমাই একদিন হলেও হতে পারে হিরোসীমা - ....

কাব্যসৌন্দর্য

২) (অ) 'আমরা সকলে হিংস্র হয়ে উঠব'- যে পঙক্তির মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে, সে পঙক্তিটির অর্থ লেখ।

(আ) আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাবো ....

(১) ধন সম্পদ (২) একটি স্বপ্নের উপহার (৩) জমি - জায়গা

অভিব্যক্তি

৩) (অ) 'মানুষই মানুষের বন্ধু-' এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

(আ) 'পৃথিবীকে দূষণ মুক্ত করার দায়িত্ব সকলেরই- ' এ ব্যাপারে - তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

রসাস্বাদন

৪) কোন পঙক্তির মাধ্যমে এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নের কথা তুলে ধরা হয়েছে ?

সাহিত্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান

৫) বিবরণ দাও :-

(অ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ করো :-

(১) মুক্তি শব্দটি শুধু লেখা থাকবে কিনা ইতিহাসের পাতায়।

(২) তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাব।

(আ) সুনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।

****

কবিগুরু

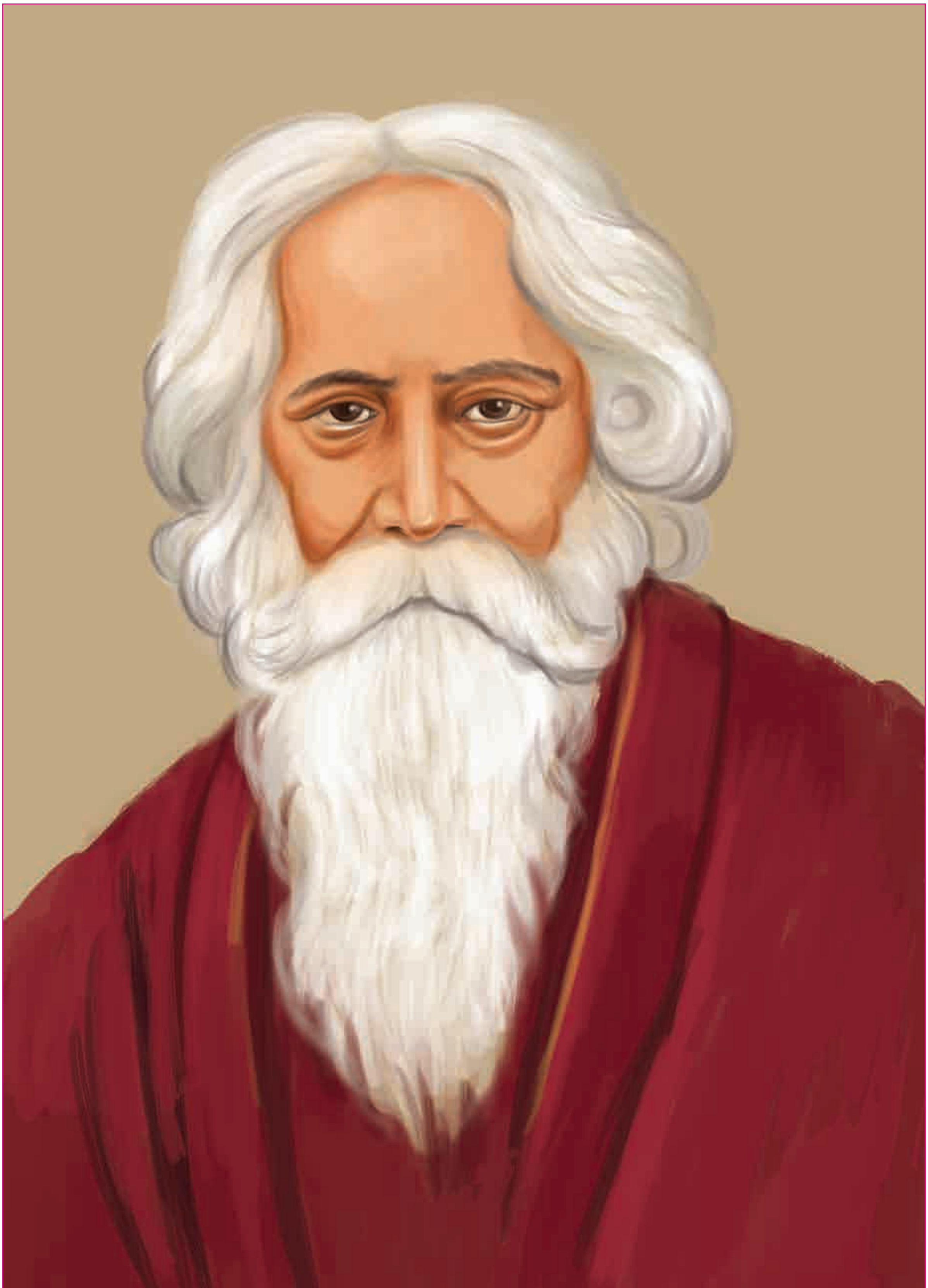

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কেবল নয়, পৃথিবীর যে কবির নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে তিনি হলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহু যুগের বহু সাধনায় এই ধরনের মনীষীকবির জন্ম হয়ে থাকে। শেক্সপীয়ার, গেটে, হোমার, ভার্জিল, মিলটন প্রভৃতি বিশ্ব বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে তাঁর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। ইনি আমাদের দেশের ব্যাস-বাল্মিকী- কালিদাসের মতনই শক্তিধর কবি। এঁর তুল্য কবি সত্যি সত্যিই দুর্লভ। ইনি কেবল নমস্য কবি নন, আমাদের প্রিয় কবি। কবির কাজ যদি হয়, আমাদের অন্তরের ভাবনা, আনন্দ-হর্ষ এবং সুখ-দুঃখ কে ভাষা রূপ দেওয়া, তা এ কাজে রবীন্দ্রনাথের তুল্য আর কে আছেন? অসাধারণ ভাবে ভালোবেসে তিনি আমাদের 'প্রিয়' হয়েছেন, আর তাঁর সূক্ষ্ম-হৃদয়- সংবেদনার গুণে তিনি হয়েছেন 'প্রিয়তর'।পিতা-মাতার চোদ্দতম সন্তানরূপে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ এ বৈশাখ (ইংরেজি ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম। ঋষির মত ছিলেন বলেই তাঁকে 'মহর্ষি' বলা হত। বিদ্যালয়ের হৃদয়হীন নির্মম গতানুগতিকতা শিশু রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল না। তাই তাঁর বিদ্যালয়ের পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সে যুগের বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পোৎসাহী সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের বড়োদাদা ছিলেন একজন সম্মানীয় দার্শনিক ও কবি । তার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেযুগের অভিজাত শ্বেতাঙ্গ- প্রধান ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রথম ভারতীয় সদস্য। নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রতিভাবান সংগীত স্রষ্টা ও নাট্যকার। তার এক দিদি স্বর্ণকুমারীদেবী ছিলেন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। বালক 'রবি'- র এঁদের সকলের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে সামান্য বড়ো তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু স্থানীয় এবং তাঁর রচনার এক অনুপ্রেরণা।১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু বহুবছর রবীন্দ্রনাথের মনকে অশান্ত করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও এই মৃত্যু একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

বাল্য অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে মূলত পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হত। একমাত্র স্কুলে যাওয়া ছাড়া অন্য সময় বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ফলতঃ বাইরের জগৎ ও প্রকৃতির সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন বালক রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুর বাড়ির ভৌতিক ও রহস্যময় সত্ত্বাটিও রবীন্দ্রনাথকে সন্ত্রস্ত করে রাখত।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটেছিল অতি শৈশব কাল থেকে। নয় বছর বয়স থেকেই তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বহু বর্ণময়।

তাঁর কাব্য কখনও রক্ষণশীল ধ্রপদী শৈলীতে, কখনও হাস্যোজ্জ্বল লঘুতায়, কখনও বা দার্শনিক গম্ভীরে, আবার কখনও বা আনন্দের উচ্ছ্বাসে মুখরিত, তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সৃষ্টিশীলতা ও সৌকর্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয়, গ্রামীণ বাংলার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের পরেই বাউল সংগীতকে পুনরাবিষ্কার করে জনপ্রিয় করে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'কল্পনা', 'গীতাঞ্জলি', 'গিতালি', 'গীতমাল্য' থেকে 'বালকা', 'পূরবী', 'ক্ষণিক', 'চৈতালি', 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ', 'আরোগ্য', 'নবজাতক', 'শেষ লেখা' ইত্যাদি কাব্যের মাধ্যমে তিনি যে কাব্য জগৎ তৈরি করেছেন, তাঁর তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্য পাওয়া দুর্লভ। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই কবি প্রতিভা বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পায়। এবং 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রচনার কারণে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিতাই লিখতেন না। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি সবলেখাতেই তিনি তার প্রতিভাকে প্রমাণিত করেছেন। তার ছোটগল্পগুলি আজও অসাধারণ। 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'গুপ্তধন', 'পোস্টমাস্টার', দেনাপাওনা, ক্ষুধিত পাষাণ ইত্যাদি গল্পগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। 'নৌকাডুবি', 'চোখেরবালি', 'গোরা', 'রাজর্ষি' ইত্যাদি উপন্যাসের তুলনা হয়না। 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী', 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', গুরু ইত্যাদি নাটকের সঙ্গে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যে রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ আজও আমাদের কাছে প্রিয়।

কেবল কবি নন, ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি নিজে গান গাইতে পারতেন এবং ছিলেন খুব উঁচুদরের চিত্রশিল্পী। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ এতই গভীর ছিল যে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের তাঁর বহু খ্যাত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। দেশবাসীকে যথার্থ পরিবেশে প্রকৃত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরের কাছে প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন'। 'বিশ্বভারতী' ছিল তার আদর্শে তৈরী একটা অন্যতম অনুপম শিক্ষায়তন। তিনি এক ধারে ছিলেন একজন বড়ো দার্শনিক, বড়ো চিত্রকার, বড়ো সংগীতজ্ঞ এবং বড়ো একজন অভিনেতা। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন আচার্যও। সর্বযুগের সর্বকালের সেরা মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের গর্ব। সাহিত্য সেবা ও দেশ সেবা করতে করতে ৮০ বছর বয়সে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ ২২এ শ্রাবণ (ইংরাজী ৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে তার আদর্শ সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'অচলায়তন' নাটকটিকে অভিনয়যোগ্য করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে কিছু অংশের বর্জন, রূপান্তর ও পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে যে নতুন রূপ দেন, তারই নাম হয় 'গুরু'।

গুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-:পাঠের মূলকথা:-

এই নাটকে পঞ্চক, মহাপঞ্চক,সুভদ্র, আচার্য, উপাচার্য, দাদাঠাকুর প্রভৃতি চরিত্র রয়েছে। দাদাঠাকুরই প্রকৃত গুরু হয়ে ওঠেন। সত্য আর সুন্দরের নিবিড় মিলনেই দাদাঠাকুর গুরু হয়ে ওঠা এখানে লক্ষনীয় বিষয়। গুরু কোনো ব্যক্তি নয়; তা একটি ধারণা, যা বদ্ধ প্রাণহীন জীবনে আলোর পথ দেখায়, মুক্তির গান শোনায়। কখন ও আভাসে-সংকেতে, কখনোও দাদাঠাকুর বা গোঁসাই ঠাকুরের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

১ অচলায়তন

[একদল বালক]

প্রথম : ওরে ভাই শুনেছিস?
দ্বিতীয় : শুনেছি-কিন্তু চুপ কর।
তৃতীয় : কেন বল দেখি?
দ্বিতীয় : কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়?
প্রথম : কিন্তু উপাধ্যায় মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।
তৃতীয় : কী বলেছেন বল-না।
প্রথম : গুরু আসছেন।
সকলে। গুরু আসছেন।
তৃতীয় : ভয় করছে না ভাই?
দ্বিতীয় : ভয় করছে।
প্রথম : আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।
তৃতীয় : কিন্তু ভাই গুরু কী?
দ্বিতীয় : তা জানি নে।
তৃতীয় : কে জানে?
দ্বিতীয় : এখানে কেউ জানে না।
প্রথম : শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয় : তাহলেএখানে কোথায় ধরবে?
প্রথম : পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।
তৃতীয় : কোথাও না?
প্রথম : কোথাও না ।
তৃতীয় : তাহলে কি হবে?
প্রথম : ভারী মজা হবে।

(প্রস্থান)

(পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক : গান

তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে কেউ তা জানে না ।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না ।
ওরে ভাই, কে আছিস ভাই, কাকে ডেকে বলব,গুরু আসছেন।

(সঞ্জীবেরপ্রবেশ)

সঞ্জীব : তাই তো শুনেছি কিন্তু কে এসে খবর দিল বলতো।
পঞ্চক : কে দিলে তা তো কেউ বলে না।
সঞ্জীব : কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পঞ্চক?
পঞ্চক : বাঃ, সেই জন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।
সঞ্জীব : সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?
পঞ্চক : আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ঐ-সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।
সঞ্জীব : তাই তো দেখছি

(প্রস্থান)

পঞ্চক (গান)

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।
ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো।
গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম : আরে ছুঁয়ো না; এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।
পঞ্চক : গুরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?
জয়োত্তম : তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছো।
পঞ্চক : তোমরাও জানো না, আমিও জানি নে-তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।
জয়োত্তম : আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই ।

[প্রস্থান

পঞ্চক :

(গান)

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক : গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক : এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক : আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক : ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক : কেন বল তো?

পঞ্চক : গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক : গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক : তার জন্য ভাবনা কী? নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাবো।

মহাপঞ্চক : মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক : সেই ভরসাতেই তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক : অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা-

পঞ্চক : সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভুলবার চেষ্টায় আছি।সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক : ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্ত কুমারিকা গাঁথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি,সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক :

(গান)

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

ও কি ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ওই বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

[প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ]

পঞ্চক : তোর কোন ভয় নেই ভাই, কোন ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল-কি হয়েছে বল।

সুভদ্র : আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক : পাপ করেছিস! কী পাপ?

সুভদ্র : সে আমি বলতে পারবো না। ভয়ানক পাপ। আমার কি হবে?

পঞ্চক : তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র : আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের-

পঞ্চক : উত্তর দিকের?

সুভদ্র : হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে-

পঞ্চক : জালনা খুলে কী করলি?

সুভদ্র : বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক : দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র : হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না- একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক : ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকতো- আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারিনি।

(বালকদলের প্রবেশ)

প্রথম : অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয় : জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক : চুপ চুপ! ভয় নেই, সুভদ্র কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি।প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম : (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা-

পঞ্চক : আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয় : আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয় : সে দিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে

পঞ্চক : তাহলে কী ?

তৃতীয় : সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক : কি ভয়ানক শুনিই- না।

তৃতীয় : জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র : পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক : শোন বলি সুভদ্র, কিসে কি হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে- কিন্তু যাই হোক- না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র : ভয় করো না?

সকল : ছেলে। ভয় কর না ?

পঞ্চক : না আমি তো বলি, দেখিই- না কী হয়।

সকলে : (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক : দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার ওপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে : অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র : পঞ্চকদাদা, তোমার কী হলো?

পঞ্চক : তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি?

প্রথম : কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয় : মহামযূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক : তার রাগটা কি রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র : কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক : তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না-ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয় : না, না বলিস নে।

তৃতীয় : না, সে আমরা শুনতে পারব না! কী ভয়ানক!

প্রথম : আচ্ছা, একটু-খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র : আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে-

বালকগণ : (কানে আঙুল দিয়ে) ও বাবা, না না, আর শুনবো না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ-যে উপাধ্যায় মশাই আসছেন। চল চল-আর না।

পঞ্চক : কেন? এখন তোমাদের কী ?

প্রথম : বেশ, তাও জান না বুঝি? আর যে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র-

পঞ্চক : তাতে কী?

দ্বিতীয় : আজ কাকিনি সরোবরের নৈঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক : কেন রে?

প্রথম : তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয় : আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক : তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম : পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য ।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগনের প্রস্থান

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

সুভদ্র : উপাধ্যায় মশায়!

পঞ্চক : আরে পালা পালা। উপাধ্যায় মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্তি করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায় : কি সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র : আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক : ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায় : (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক : আর রক্ষা নেই, পাপের এতোটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায় : কী বলছিলে?

সুভদ্র : আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায় : পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র : আমি আয়তনের উত্তর দিকের-

উপাধ্যায় : বলো, বলো উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র : না আমি উত্তর দিকের জানলায়-

উপাধ্যায় : বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুর কে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক : এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়া সংগ্রহে আছে, ভূমি কুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার- উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়া সংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক : (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি। -কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি-

উপাধ্যায় : কুল দত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে-তাতে-

সুভদ্র : উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক : আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায় : সুভদ্র, উত্তর এর দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ না গোলাকার?

সুভাদ্র : আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায় : (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী? আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র : আমার কী হবে?

পঞ্চক : (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[প্রস্থান]

(আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ)

আচার্য : এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য : :তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য : প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য : নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য : এক-এক সময় মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য : না আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি-কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য : কঠোর নিয়ম? হাঁ সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য : বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য : না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য : কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য : সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ।

উপাচার্য : আমার তো এক মুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য : অশান্তি নেই?

উপাচার্য : কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য : ঠিক, ঠিক-ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত-এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়-তার জন্য একটুও বাইরে যাওয়ার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য : আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য : কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেওয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য : কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হওয়ার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যেও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য : আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান]

[পঞ্চকের প্রবেশ]

আচার্য : (পঞ্চক এর গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক : করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য : কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক : আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য : কেন পারোনি বৎস?

পঞ্চক : প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য : সৌম্য, তুমি তো জানো, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক : আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য : যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক : আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নিচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য : কেমন করে বৎস?

পঞ্চক : তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে,নিযমের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য : তুমি কী কর না- কর আমি কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক : আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান?

আচার্য : না না থাক্, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি-

পঞ্চক : তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য : না-না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে- তুমি ভুল করো গে- আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক : ঐ উপাচার্য আসছেন- বোধ করি কাজের কথা আছে- বিদায় হই।

[প্রস্থান]

(উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ)

উপাচার্য : (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন-কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য : উপাধ্যায়, কোন সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায় : অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য : অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায় : আচার্দেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য : উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায় : সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য : এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য : আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি-

উপাধ্যায় : না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্ত তার প্রয়োজন হয়নি-সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে-যদি কারো জানা থাকে তো সে ওর।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

উপাধ্যায় : মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক : সেইজন্যেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য : এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক : ক্রিয়া কল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না-একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়নে লিখছে,অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক : হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য : তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায় : চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুন্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্দম]

আচার্য : শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায় : কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য : প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক : প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ন খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি-আচার্য। দরকার নেই-সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার-মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই আপনি কি তাই-

আচার্য : না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার।তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায় : এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনদিন দেখি নি! এইতো সেবার অষ্টাঙ্গ শুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম বিধি তো চিরকালের।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক : ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই-এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য : বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান]

উপাধ্যায় : একি হল উপচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক : আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাসে সকলই পন্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায় : এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক : উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন। এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটলো! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

[সঞ্জীব,বিশ্বম্ভর,জয়োত্তমের প্রবেশ]

সঞ্জীব : এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই-সব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর : আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেরকম আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম : তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্য তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায় : কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা : সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক : কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা : মুর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক : পঞ্চক?

অধ্যেতা : হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক : না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির । কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা : আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদিনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব : স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর : ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী ! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম : তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর : না না, আচার্যকে আমরা-

মহাপঞ্চক : কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর : তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক : আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব : কেমন করে ?

মহাপঞ্চক : কেমন করে আবার কী? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম : আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে-

মহাপঞ্চক : হাঁ, তাঁকে বন্ধ রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

(আচার্যের প্রবেশ)

আচার্য : বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব : তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য : গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক : (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা আয় রে নবীন কিশলয়- তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে-আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক : পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম।

পঞ্চক :

গান

ওরে আমার মন মেতেছে,
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক : উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন—ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক : না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে –

ওরে ভাই নাচ রে ও ভাই নাচ রে-
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে-
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক : উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক : সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক : চুপ কর লক্ষীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্নবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর : আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য : না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব : ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও-যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য : গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু,সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম : দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন,তাতে আমরা বল প্রয়োগ করতে বা বাধ্য হব।

আচার্য : করো, বল প্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য,তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বুঝতেপারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর : পারবেন না?

আচার্য : না।

মহাপঞ্চক : তাহলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম : খবরদার-আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর : না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারবো না।

সঞ্জীব : আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর : এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণ ত্যাগ করেছে-তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

[সুভদ্রের প্রবেশ]

সুভদ্র : আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক : সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য : বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার- আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর : না না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব : তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর : তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায় : আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক : আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপূণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য : হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক : সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই-আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য : বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র : না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে-লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক : ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য : না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না- এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান]

মহাপঞ্চক : ধিক্! তোমাদের মত ভীরু দের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই।তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকে মারবে।

(পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক : স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক : ব্যাপারখানা কী! এ-যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা : নরদেবগন, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে : জয়োস্ত রাজন্ ।

মহাপঞ্চক : কুশল তো?

রাজা : অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্ত দেশের দুতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্য সীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক : দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা : ওই যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক : যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লন্ডভন্ড করে দেবে!

রাজা : সেইজনই তো ছুটে এলুম। চন্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক : ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা : সে কী কথা!

সঞ্জীব : আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা : একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক : যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জালনা খোলা হয়েছে।

রাজা : (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক : আচার্য অদীনপুণ্য এপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর : তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা : দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক : আগামী অমাবস্যায়-

রাজা : না না, এখন তিথি নক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি-শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক : হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা : তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিকপালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক : অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা : আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যুনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধকরে রেখো।

জয়োত্তম : আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি-অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক : যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লংঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তার উচিত দন্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চক কে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

(দূতের প্রবেশ)

দুত : শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা : কে বললে?

দূত : চারি দিকেই কথা উঠেছে।

রাজা : তাহলে তো তার অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধি মন্ত্র পাঠ করতে থাকো।

মহাপঞ্চক : জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান]

পঞ্চক : কোথায়?

জয়োত্তম : শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক : পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারীগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২ পাহাড় মাঠ

(পঞ্চকের গান)

এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে-
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিক পানে-
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোনখানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

[পশ্চাতে আসিয়া যূনক দলের নৃত্য]

পঞ্চক : ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি?

প্রথম যূনক : আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় যূনক: আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক : আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় যূনক কই রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যুনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক : জানিস আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক : সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কি রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক : নতুন ও আছে পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক: আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো- একবার দেখবো তাঁকে।

পঞ্চক : তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে- তাকে নিয়েই-

তৃতীয় যূনক: গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যূনক : সেই জন্যই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক: আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক- তার কী জানি ভারী লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আচার্য কী-একটা ফল পাবে- তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক : কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক : বলতে পারি নে! কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজ করিস-সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক : চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে.
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।।

পঞ্চক : আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয়- কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস?

প্রথম যূনক : করি বৈকি।

পঞ্চক : কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় যূনক কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক : তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম যূনক : কেন?

পঞ্চক : কেন কী রে ! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক : কেন নিষেধ?

পঞ্চক : শোনো একবার! নিষেধ, আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে, কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক: কেন? ওটা কি তোমরা খাও না।

পঞ্চক : খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই-কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক: কেন?

পঞ্চক : ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি?

দ্বিতীয় যূনক: কাকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক : আবার কেন ? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক: আর খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক : একবার কোন যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর পড়েছিল; তাতে তার উপবাসের পুণ্যফল থেকে যষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিড়ালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কি করতিস বল দেখি !

প্রথম যূনক : আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক : আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস-তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস? প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক : রাম রাম ! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক ; কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক : আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক: তা তো হবে।

পঞ্চক : তবে আর কী– এই বুঝে নে না ।

দ্বিতীয় যূনক: তবু একটা তো কারণ আছে ।

পঞ্চক : কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা,তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি? দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র?

পঞ্চক : এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র-তট তট তোতয় তোতয়-

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক : আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস? প্রথম যূনক। না ।

পঞ্চক : মরীচী ?

প্রথম যূনক : না ।

পঞ্চক : মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক : না ।

পঞ্চক : উষ্ণীষবিজয় ?

প্রথম যূনক : না।

পঞ্চক : নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী ?

তৃতীয় যূনক: সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক : না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক: খুব পারি।

পঞ্চক : ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই। তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছুই থাকবে না। ভাই,তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

(যূনকগনের গান)

সব কাজে হাত লাগাই মোরা,সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে। আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক : সর্বনাশ করলে রে-আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না।এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোনদিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব–কিন্তু খেঁসারির ডাল-না না,পালা ভাই,পালা তোরা।
দেখছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

(আর-একদল যূনকের প্রবেশ)

প্রথম যূনক : ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক: এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো- দাদাঠাকুর আসছে।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

প্রথম যূনক : দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর : কী রে?

দ্বিতীয় যূনক: দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর : কী চাই রে?

তৃতীয় যুবক: কিছু চাই নে- একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক : দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর : কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক : ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক : আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক : ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস,আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক : নিয়ে যাও-না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে,পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক : দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর : গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক : একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর : আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছো কেমন বলো তো?

পঞ্চক : ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন-হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

(একদল যূনকের প্রবেশ)

দাদাঠাকুর : কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম যূনক : চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর : কে মেরেছে?

দ্বিতীয় যুনক: স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক : আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক: স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক: আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক : আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝন্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর : চলো তবে ।

প্রথম যূনক : কোথায়?

দাদাঠাকুর : স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক: এখনই?
দাদাঠাকুর : হাঁ এখনই।
সকলে : ওরে, চল্ রে চল্।
দাদাঠাকুর : আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।
প্রথম যূনক : দেব ধুলোয় লুটিয়ে।
সকলে : দেব লুটিয়ে।
দাদাঠাকুর : ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।
সকলে : হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।
দাদাঠাকুর : আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।
সকলে : হাঁ, চলবে, চলবে।
পঞ্চক : দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?
প্রথম যূনক : চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।
দাদাঠাকুর : না না, পঞ্চক না । যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।
পঞ্চক : কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।
দাদাঠাকুর : না পঞ্চক, না তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

৩ দর্ভকপল্লী

[পঞ্চক ও দর্ভকদল]

পঞ্চক : নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!
প্রথম দর্ভক: তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?
পঞ্চক : তোমাদের যা আছে তাই আমরা খাব।
দ্বিতীয় দর্ভক আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।
পঞ্চক : সেজন্য ভাবিস নে ভাই । পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো । ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?
তৃতীয় দর্ভক: ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত- আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।
পঞ্চক : সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে। তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা,সকালবেলা তোরা কী করিস বল তো?
প্রথম দর্ভক: আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।
পঞ্চক : সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।
দ্বিতীয় দর্ভক ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক : আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি- তোরা আমাকেও হাসাবি- শুনেও মন খুশি হয়। কিন্তু ভাবিস নে–নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক: আচ্ছা ভাই, আয় তবে–গান ধর।

গান

ও অকুলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল-
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক : দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদর ঐ গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক: বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য : সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো-

আচার্য : বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক: আমরা তুলে আনব- সে কি হয়!

আচার্য : হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক: ওরে চল তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান]

পঞ্চক : মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য : ঐ, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক : কী বলুন দেখি ?

আচার্য : আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে ।

পঞ্চক : এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোন শব্দ।

আচার্য : তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক : এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে- আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তাহলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম- কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য : ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক : কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক: শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য : লড়াই কিসের? আজ তো গুরুর আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য : ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক: লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক: শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না,পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক : আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম, স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য : তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক : হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই।রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক আমরা শুনেছি, কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য : গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল?

পঞ্চক : তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে, দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক : দাদাঠাকুরের দল! বল বল শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি- দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক : আয়-না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক : হাঁ লড়ব।

আচার্য : কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে ?

(মালীর প্রবেশ)

মালী : আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য : বলিস কী? গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক : এখানে তোমাদের গুরু এলে তাকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তার বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও- আমরা যাতে সরে যাই।

(আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক	বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়-সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ-যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক	আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক	হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক	ঘরে কী আছে রে ভাই, সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক	বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক	আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক	কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য	:	(প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয় ।

পঞ্চক	:	এ কি! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

গর্ভকদল	:	গোসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি। দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক	আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর :	আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক	:	দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক	ঐ তো আমাদের গোসাই- পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান]

দাদাঠাকুর :	আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য	:	কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি–আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর :	যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য	:	কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাকে বাধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর :	যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাকে হারাতে হয়।

আচার্য	:	আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি। তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলাম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর : যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য : ধন্য করেছ! - কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই। এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর : এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক : ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর যে জানতে চায় না যে, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক : প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমিতো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক : কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক : আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক : কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেই জন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ফেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক : আমাকে কি করতে হবে?

দাদাঠাকুর যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক : সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর না যদি কুলোয় তাহলে দেয়াল আর- একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান]

৪ অচলায়তন

(মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম)

মহাপঞ্চক   তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছো কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর   তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই- যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক   এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ?

সঞ্জীব : কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক : সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম : আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক : তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা- বাপ ভাই- বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না- দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব : গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক : আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর : ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক : নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক : কত দূর?

উপাধ্যায় : কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক : কইদ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায় : বিশেষ দরকার দেখি নে- কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে- ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক : বল কি, দার ভেঙেছে?

উপাধ্যায় : শুধু দ্বার নয়, প্রাচীর গুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। ঐ দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক : কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে-

উপাধ্যায় : তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ : কি সর্বনাশ!

সঞ্জীব : কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর : আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব : কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম : আমাদের আচার্যদেব কে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব : কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায় : সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক : তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিভে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক- দেবতার আশ্চার্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায় : তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর : আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব : শুনছ- ঐ শুনছ, ভেঙ্গে পড়ল সব ।

ছাত্রগণ : কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

(বালকদলের প্রবেশ)

উপাধ্যায় : কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায় : মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে - সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক হাঁ,বন্ধ।

সকলে : ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক আজ পঙক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক না।

সকলে : ওরে কী মজা। আ: আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম: আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর : আজ একটা অদ্ভুত কান্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব : কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক মনে হচ্ছে ছুটি- আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান]

জয়োত্তম দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই- নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

(শঙ্খ বাদক ও মালীর প্রবেশ)

উভয়ে : গুরু আসছেন।

সকলে : গুরু!

মহাপঞ্চক শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে : ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর । মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে : জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

(যোদ্ধৃবেশে দাদা ঠাকুরের প্রবেশ)

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায় তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর হাঁ তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমি তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক তুমি গুরু? তবে এই শত্রু বেশে কেন?

দাদাঠাকুর এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে- সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক : না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না- আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর: আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক : তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর : এরা আমার অনুবর্তী এরা যূনক।

সকলে : যূনক!

মহাপঞ্চক : এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর হাঁ।

মহাপঞ্চক : এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য- আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর : আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই , আদেশ।

মহাপঞ্চক : উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজা গুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায় : এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক অচলায়তনের দরজার কথা বলছ- সে আরো আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায় : বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক : পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম- যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক এই পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক ; কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক: ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই- আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক ওকে কি কোন শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছায় না।

(বালক দলের প্রবেশ)

সকলে : তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর: হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে : আমরা প্রনাম করি।
দাদাঠাকুর বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।
প্রথম বালক ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?
দাদাঠাকুর : আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।
সকলে : খেলবে?
দাদাঠাকুর; নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?
সকলে : কোথায় খেলবে?
দাদাঠাকুর আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।
প্রথম বালক মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?
দাদাঠাকুর এর চেয়ে অনেক বড়ো।
দ্বিতীয় বালক এর চেয়েও বড়ো ? ঐ আঙিনাটার মতো?
দাদাঠাকুর তার চেয়ে বড়ো।
দ্বিতীয় বালক তার চেয়ে বড়ো !উঃ কী ভয়ানক!
প্রথম বালক সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?
দাদাঠাকুর কিসের পাপ?
দ্বিতীয় বালক খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?
দাদাঠাকুর খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।
সকলে : কখন নিয়ে যাবে?
দাদাঠাকুর: এখানকার কাজ শেষ হলেই।
জয়োত্তম : (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।
বিশ্বম্ভর : সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।
সঞ্জীব : মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো- না।
মহাপঞ্চক : না, আমি না।

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র : গুরু!
দাদাঠাকুর : কি বাবা।
সুভদ্র : আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।
দাদাঠাকুর: তার আর কিছু বাকি নেই।
সুভদ্র : বাকি নেই?
দাদাঠাকুর : না আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।
সুভদ্র : একজটা দেবী -
দাদাঠাকুর : একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো- তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।
সুভদ্র : এখন আমি কি করব?
পঞ্চক : এখন তুমি আছো ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ

পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

(যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান)

ভেঙেছে দুয়ার,   এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির- বিদার   উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর,   নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ,   এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

****

শব্দার্থ :

সিংহদ্বার = প্রধান প্রবেশদ্বার

বারতা = খবর

ভূমিকুষ্মাড = ভুঁইকুমড়ো

ম্লেচ্ছ = অস্পৃশ্য

মহাতামস = একপ্রকার পাপ ক্ষালন ব্রত

বুদ্ধিবিকার =বুদ্ধিনাশ

অনুশীলনী

আকলন

কার্য সম্পাদন করো ।

১) অ) 'গুরু' নাটকে অচলায়তনের রীতি হলো -

আ) মহাতামস ব্রত পালনের ক্ষেত্রে পাপী ব্যক্তিকে যেখানে থাকতে হয় -

১) নির্জন কক্ষে ২) মাঠের মধ্যে ৩) অন্ধকার কক্ষে ৪) আলোক কক্ষে

২) কারণ লেখ ।

অ) অচলায়তনের লোকেরা লড়াই করতে পারবেন না -

আ) দাদা ঠাকুর পঞ্চককে তার দলে নিলেন ------

ই) যূনকরা চাষ করে ------

ঈ) একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচলায়তন হয়ে ওঠে

উ) অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে-----

প্রশ্ন ৩) সূচনা অনুসারে কার্য করো:-

অ) গুরু নাটকের বৈশিষ্ট্য : ------

আ) প্রকৃত গুরুর স্বরূপ : ------

প্রশ্ন ৪) অ) গুরু নাটকের মহত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং তার স্পষ্টীকরণ কর ।

আ) অসত্য কথন বুঝে নিয়ে তাহাকে সঠিক ভাবে লেখ।

১) অচলায়তন নাটকে গানের ব্যবহার নেই।

২)পঞ্চক এসে দক্ষিণের জানলা খুলে দিয়েছিল।

৩) যূনকরা ছিল নিন্দিত এবং অস্পৃশ্য ।

প্রশ্ন ৫) লেখ:-

১)পঞ্চক চরিত্রের আদর্শ-

২) সুভদ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ------

৩) অচলায়তনের আগের ও পরের অবস্থা-

৪) যূনকরা নিঃসংকোচে যে যে কাজ করতে পারে-

৫)অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়াতে ছাত্রদের প্রিতিক্রিয়া----

অভিব্যক্তি

প্রশ্ন ৬)

১) 'কর্মই পূজা' - এ বিষয়ে তোমার অভিমতব্যক্ত করো।

২) একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'অচলায়তন' হয়ে ওঠে-এই ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করো।

৩) ‘খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়’ - এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।
৪) ‘বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা হবে প্রাণোচ্ছল’ - এই বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।
৫) ‘ঈশ্বরের অবস্থান সর্বভূতে’-এই বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।
৬) ‘প্রকৃত গুরুই প্রকৃত শিক্ষা দান করেন’ - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।

লঘুত্তরী প্রশ্ন

প্রশ্ন ৭)

১) ‘গুরু’ নাটকে সংগীতের ভূমিকা আলোচনা করো।
২) সুভদ্রের উত্তর দিকের জানলা খোলা অচলায়তনে কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল?
৩) গুরু নাটকে পঞ্চক কিভাবে যুক্তিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে?
৪) সুভদ্রের কেন মনে হয়েছিল যে সে পাপ করেছে।
৫) মহাপঞ্চক এর সঙ্গে আচার্য অদীনপুণ্যের বিরোধিতার কারণ লেখ।

সামান্য জ্ঞান

প্রশ্ন ৮:-

১) ‘গুরু’ নাটকে সংলাপ রচনায় নাট্যকারের সার্থকতা আলোচনা করো।
২) ‘গুরু’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

ব্যাকরণ

বচন বদলাও:-

বালক	শিশু
ছেলে	পন্ডিত
আম	সেপাই
তুমি	শিক্ষক
দেবতা	পাহাড়

সন্ধি বিচ্ছেদ করো :-

প্রত্যেক	বনৌষধি
প্রত্যক্ষ	নয়ন
শতেক	বারেক
বিবেকানন্দ	অন্বেষন
হিমালয়	উদ্ভিদ
বিদ্যালয়	জনৈক

সূত্র সঞ্চালন

ইন্দ্রায়ণী দাসগুপ্তা

ইন্দ্রায়ণী দাসগুপ্তের জন্ম ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরে হয়েছে। তিনি আগরতলা থেকে বি.এ.পাস করে কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের শিক্ষকতার অনুভব রযেছে। বাংলা ভাষায় বিশেষ রুচি ছিল। অনেক পত্রিকায় তিনি লেখনের কাজ করছেন ।

-:পাঠের মূলকথা:-

উদ্দেশ্য:- বিদ্যালয়ে বা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক সভারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই সময়ে যে স্টেজ বা মঞ্চ পরিচালনা করা বা সঞ্চালন করার প্রয়োজন হয় তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাজে সহায়তা করা দরকার। তাতে তাদের সূত্র-সঞ্চালন প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। ভবিষ্যতে তারা আরও বড় মঞ্চে সূত্র-সঞ্চালন করতে পারবে।

(ববিতা, সরিতা, রাকেশ,রিমা, সুব্রত, অস্মিতা এবং সুজন এরকম কিছু একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা চর্চা করছে।)

রিমা : বন্ধুরা! তোমরা কী জানো যে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে যার সঞ্চালন আমাদেরই করতে হবে, বিকাশ করতে হবে।

ববিতা : অর্থাৎ সঞ্চালনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে ? এতো খুবই কঠিন কাজ।

সরিতা : এই কাজ এত কঠিন নয়। আমরা সকলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু এর তৈরি কেমনভাবে করতে হবে?

সুব্রত : সর্বপ্রথমে দেখতে হবে যে এই অনুষ্ঠানের বিষয় কি হবে।

রাকেশ : এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে তো আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বলিবেন।

অস্মিতা : তবে আমাদের কেমনভাবে তৈরি করতে হবে?

সরিতা : রিমা, তুমি তো এরকম অনুষ্ঠানের জন্য আগে থাকো। আমরাই একটি কাগজ-কলম নিয়ে এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু লিখি।

ববিতা : সর্বপ্রথমে আমাদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে যার বিষয়ে আমাদের শিক্ষকগণ এবং অন্য মাধ্যম থেকে তথ্যকে একত্রিত করতে হবে ।

সুব্রত : এর সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠান সূচি তৈরি করতে হবে যাতে অনুষ্ঠানের বিষয়ে ক্রমবদ্ধ উল্লেখ থাকবে।

সরিতা : আমার মনে হয় সঞ্চালনের কাজ রিমা ও ববিতা ঠিকভাবে করতে পারবে।

ববিতা : আমি সঞ্চালনের কাজ তো করতে পারবো, তার জন্য আমার লিখিত উপকরণ দরকার।

অস্মিতা : এই কাজ দুলালী অনেক ভালোভাবে করতে পারবে কেননা তার হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর। যদি সে এখন এখানে থাকত---- ওই দেখো দুলালী এসে গেছে।

[দুলালীর প্রবেশ]

দুলালী : কী লেখার কথা বলা হচ্ছে?

রিমা : আমরা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনের তৈরি করছি, যার জন্য আমাদের হস্তলিপি লিখতে হবে।

দুলালী : এই কাজ তো আমি ভালোভাবে করতে পারি। এরমধ্যে আমি উদ্ধৃতি এবং সংগীতের সমাবেশও করে দেব। কিন্তুতোমরা আমাকেঅনুষ্ঠান মঞ্চে কিছু বলতে বলবে না।

রিমা : না-না, তার প্রয়োজন হবে না। আমি আর ববিতা দু'জনে মিলেই সঞ্চালন করে নেব। আরে! আমাদের দিদিমণি এবং মাস্টার মহাশয় আসছেন।

(সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দিদিমণি ও মাস্টার মহাশয় দিগকে সম্মান জানালো, দিদিমণি ও মাস্টার মহাশয় সম্মান স্বীকার করে সবাইকে বসতে বললেন।)

দিদিমণি : আজ আমাদের খুব আনন্দের ও উৎসাহের মুহূর্ত। আমাদের প্রধান শিক্ষকমহাশয় একাদশ শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী দিগকে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। তোমরা সবাই তৈরি তো ? আশা করি তোমরা ভালোভাবে সেটা করবে। আজ জানুয়ারীর ১০ তারিখ। আগামী জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে অনুষ্ঠান হবে। তোমরা ১২/১৩ দিন সময় পাচ্ছো। একটা কথা আছে , 'আছাড় না খেয়ে কেহ পারে না হাঁটিতে। জলে না নামিলে কেহ পারে না সাঁতার দিতে।' তোমরা যদি স্কুলের অনুষ্ঠান সঞ্চালন করো তবে দেখবে মনে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে।

ববিতা : দিদিমণি, আমরা কী সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করব?

মাস্টারমহাশয় : হ্যাঁ, তোমরাই করবে। তোমরা ভবিষ্যতে কে কি হবে জানো কি? তোমরা তো দেশের ভবিষ্যৎ.আজকাল দূরদর্শন ও প্রচার মাধ্যমে অনেক সম্ভাবনা আছে । তোমরা কেউ ভালো সঞ্চালক নির্দেশক হতে পারো। এই বিদ্যালয়ের 'রজত জয়ন্তী' উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হবে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিন অর্থাৎ ২৩ শে জানুয়ারিতে অনুষ্ঠান হবে বিদ্যালয়েরই 'শহীদ ভগৎ সিং' সভাগারে।

দিদিমণি : তাহলে মনে হচ্ছে, এই সঞ্চালনের জন্য তোমরা তৈরি শুরু করে দিয়েছ!

অস্মিতা : দিদিমণি আপনারা যদি আমাদিগকে একটু মার্গদর্শন করতেন, তাহলে খুব ভালো হতো।

মাস্টারমহাশয়: ঠিক আছে চলো আমরা তোমাদিগকে মার্গদর্শন করছি।

সরিতা : রিমা, তুমি যে অনুষ্ঠানের সূচি লিখেছো, তা দিদিমণিকে দেখাও।

রিমা : দিদিমণি এটা একটু দেখুন, ঠিক আছে কিনা।

অনুষ্ঠান সূচি

প্রস্তাবিকা
দ্বীপ প্রজ্জ্বলন
স্বাগত গীত

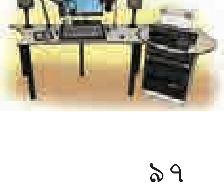

(মুখ্য অতিথি দিগকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমালা দ্বারা স্বাগত বা সম্মান করা হবে।
প্রধান শিক্ষক দ্বারা স্বাগত ভাষণ হবে।
বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সমিতির প্রধান আজকের অনুষ্ঠানের বিবরণ দেবেন।
বিবিধঅনুষ্ঠান হবে।
মুখ্য অতিথির স্নেহ ভাষণ ও আশীর্বাদ।
বিজ্ঞান শ্রেণীর প্রধান প্রতিনিধি উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদিগকে স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করবেন।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন হবে।)

দিদিমণি : তোমরা তো অনুষ্ঠানের সূচি খুব ভালোভাবেই তৈরি করেছ।

রাকেশ : দিদিমণি, আপনি কি আমাদিগকে এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু মার্গদর্শন করবেন?

মাস্টারমশাই : এসো আমরা এইঅনুষ্ঠানের সব বিষয়ের উপর চর্চা করি।

দিদিমণি : প্রাস্তাবিকে, সঞ্চালনকর্তা সর্ব প্রথমে উপস্থিত অতিথী দিগকে ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নমস্কার ও স্বাগত জানাবে । এই স্বাগতে যে কোনো ঘোষবাক্য ও বিশেষ পংক্তিও বলতে পারবে। এর পরে সঞ্চালনকর্তা অনুষ্ঠানের বিষয়ে উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে বিবরণ দেবেন। তার পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং মুখ্য অতিথী দিগকে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাবেন এবং আসন গ্রহণ করার জন্যও অনুরোধ করবে।

মাস্টারমশাই : দ্বীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং প্রধান অতিথীদিগকে অনুরোধ জানাবে।

দিদিমণি : স্বাগত সম্মানে মুখ্য অতিথীদিগকে স্বাগত পুষ্পস্তবক বা পুষ্পমালা দিয়ে করা হবে। এই অনুষ্ঠানের জন্য সঞ্চালন কর্তা দ্বারা স্বাগত করার জন্য নির্ধারিত করা ছাত্র/ছাত্রীদের একের পর এক ডেকে নেবে।

মাস্টারমশাই : বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অতিথীগণের স্বাগত, স্বাগত গীতের দ্বারা করা হবে। যাহার জন্য স্বাগত গীতের ছাত্র-ছাত্রীদের সমূহ নিজেদের বাদ্যযন্ত্র সহিত উপস্থিত থাকবে।

দিদিমণি : স্বাগত ভাষণের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধানের দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তির নাম নিয়ে মঞ্চে আসার অনুরোধ জানাতে হবে।

মাস্টারমশাই : অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিবরণ প্রস্তুত করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধানের দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিকে মঞ্চে আসার অনুরোধ করা হবে। তিনি অনুষ্ঠানের বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রস্তুত করবেন। অনেক সময়ে বিষয় বিবরণ প্রস্তুত করার জন্য এক থেকে অনেক ব্যক্তির নাম নির্ধারিত করা হয়।

দিদিমণি : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধিত ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য, অনুষ্ঠান অনুসারে তাদের মঞ্চে আসার অনুরোধ করা হয়।

মাস্টারমশাই :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরে মুখ্য অতিথীদিগকে স্নেহ ভাষণের জন্য মঞ্চে আসার অনুরোধ করা হয়। এই স্নেহ ভাষণ একাধিক ব্যক্তিও দিতে পারে। তার জন্য সঞ্চালন কর্তা আগেই স্নেহ ভাষণ দেওয়ার ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি করে নেবে ।

দিদিমণি : বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুখ্য অতিথীদিগকে স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করা হয়। তাহার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত করা হয়। এই কার্য

পূর্বেই নির্ধারিত করা হয়। তাহার জন্য আমরা সকলে তোমাদের নির্দেশ দিতে থাকব ।

মাস্টারমশাই : যে কোন অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব হচ্ছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিকে মঞ্চে আসার অনুরোধ করা হয়। সাধারণত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছে তা মেনে নেওয়া হয় অর্থাৎ এরপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

ববিতা : দিদিমণি, যদি সঞ্চালন চলাকালীন কোনো বাধা আসে, তখন আমরা কী করব?

দিদিমণি : ববিতা তুমি অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছ।

মাস্টারমশাই: অনুষ্ঠান সঞ্চালনের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য সঞ্চালন কর্তাকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। সঞ্চালনের মধ্যে যদি কোন কিছু অপূর্ণ থাকে বা বাধা আসে তখন সঞ্চালন কর্তা নিজের উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা শীঘ্র করে ক্ষমা চেয়ে অনুষ্ঠানের বাধাকে দূর করে অনুষ্ঠানকে আগে পরিচালনা করে এবং অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করার জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে।

দিদিমণি : তোমাদের উৎসাহ বা জিজ্ঞাসা দেখে আমার বড় ভালো লেগেছে। আমার তো মনে হয় এই অনুষ্ঠানকে তোমরা সফলতাপূর্বক পূর্ণ করবে।

মাস্টারমশাই: তোমাদের যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন আমাদের কাছে শুনে নেবে।

দুলালী : দিদিমণি এবং মাস্টারমহাশয়, আপনারা, আমাদের এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনের জন্য অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন- এই জন্য আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের দুইজনকে অশেষ ধন্যবাদ!

সরিতা : এস ববিতা, আমরা সকলে এই অনুষ্ঠানকে ভালোভাবে সফল করার জন্য কাজে লেগে যাই।

****

অনুশীলনী

১) ২৩ শে জানুয়ারিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তুমি কিভাবে সূত্রসঞ্চালন করেছিলে তাহা লেখ।

২) তোমার বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকান্দ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তুমি কিভাবে সঞ্চালন করেছিলে তাহা লেখ।

৩) তোমার বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুমি কিভাবে সূত্রসঞ্চালন করেছিলে তাহা লেখ।

৪) তোমার বিদ্যালয়ে 'শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান হয়েছে সেই সময় তুমি কিভাবে সূত্রসঞ্চালন করেছিলে তাহা লেখ ।

৫) তোমার বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে তুমি কিভাবে সঞ্চালন করেছিলে তাহা লেখ।

৬) তোমার বিদ্যালয়ে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া সম্মেলনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। সেই পুরস্কার বিতরনী সভার সঞ্চালন তুমি কিভাবে করে ছিলে তার রূপরেখা তৈরি করো ।

“বাংলা ই-সাহিত্য-একটি দৃষ্টি”

শ্রী অমর শিকদার

লেখক পরিচিতি :- ১৬ ই অক্টোবর ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশের খুলনা জেলার সুন্দরবন এলাকার বুড়বুড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। ১৯৬৪ সালে মা ও দাদাদের হাত ধরে ভারতবর্ষে এসে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শিবিরে কাটানোর পরে ১৯৬৭ সালে মহারাষ্ট্রের গডচিরোলী জেলার কৃষ্ণনগর গ্রামে পুনর্বসন পান। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি, বি.এ এবং পুনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন।তিনি ১৯৮০ সালে “ভারতীয় উষ্ণ দেশীয় মৌসম বিজ্ঞান সংস্থাতে (Indian Institute of Tropical Meteorology) একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক রূপে নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পদোন্নতির পর একটানা ৩৭ বছর উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই সংস্থায় রিসার্চ করে বহু সম্মানে সম্মানিত হন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়ে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি বর্তমানে পুনাতেই বসবাস করছেন। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক । সাহিত্যের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি এবং সমাজের প্রতি তার অনেক অবদান রয়েছে।

-:পাঠের মূলকথা:-

বাংলা- ই-সাহিত্যকে কোন (ইলেকট্রনিক সাহিত্য বা ডিজিটাল) সাহিত্য নামে বুঝানো হয় তা বলা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ও তার কালভাগের ও কথা বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও তার ডিজিটাল করণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ডিজিটাল করণের ফলে বাংলা সাহিত্যকে লুপ্ত হওয়া থেকে সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

সূচনা :-

বাংলা ‘ই’ সাহিত্য কে ‘ ইলেকট্রনিক’ সাহিত্য অথবা ডিজিটাল সাহিত্য নামে সচরাচর ভাবে বোঝানো হয়। ইংরেজি ভাষায় যাকে ইলেকট্রনিক লিটেরেচার অথবা ডিজিটাল লিটেরেচার নামে বোঝানো হয়। ই সাহিত্য বা ডিজিটাল সাহিত্যের সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে। ই-সাহিত্য এটি সাহিত্যের একটি ধারা যা বিশেষভাবে ডিজিটাল ডিভাইস এর মাধ্যমে যেমন কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও মোবাইলের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

যদিও বিশ্বের উন্নততম দেশগুলিতে ‘ই’ সাহিত্যের কাজ শুরু হয় ১৬০০ শতাব্দীতে, কেননা এই ই- সাহিত্যকে তারা মুদ্রণ যন্ত্রের সাথে তুলনা করে থাকেন। এই সময়েই তাই মুদ্রণ যন্ত্র মুক্তি পায়। কিন্তু যেহেতু বিংশ শতকের মাঝামাঝি(১৯৬০ -১৯৭০) সময়েকম্পিউটারের সৃষ্টির সাথে-সাথে মানব জাতি ইলেকট্রনিক জগতে সাহিত্যের বিস্তার শুরু করে তাই ইলেকট্রনিক সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে, গুরুত্বপূর্ণ ভাবে, একটি বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নেটওয়ার্ক যুক্ত কম্পিউটার দ্বারা সরাবাহিত এবং প্রাসাঙ্গিক সুযোগ সুবিধা এনে দেয়।

ফোনোগ্রাফ নামক যন্ত্রটির সাহায্যে ১৮৭৭

সালে প্রথম রেকর্ডিং করা হয়। ১৯৩০ দশকের কথোপকথন ও সংক্ষিপ্ত গল্প,বইয়ে ও বিভিন্ন অধ্যায় রাখা হয়েছিল। ১৯৭০ দশকে যখন প্রথম “অডিও বুক” শব্দটি স্থানীয় ভাষায় অংশ হয়ে ওঠে তখনই ক্যাসেট টেপ গুলি বিভিন্ন সাহিত্য ভাষা নিয়ে জন সমক্ষে প্রবেশ করে।১৯৭১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম “ই-বুক” এর বছর হিসাবে মান্যতা প্রাপ্ত করে। বাংলা ই-সাহিত্য বা ডিজিটাল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের অবশ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন বাংলা ভাষার উৎপত্তি ইতিহাস ও তার বিবর্তন। বাংলা ভাষার ইতিহাসের সাথে-সাথে আমাদের জানতে হবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও। জানতে হবে যে সব সাহিত্যিকরা, কবিরা, মনীষীরা করে দিয়েছেন বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষা তথা বাংলা সাহিত্যকে শীর্ষস্থান।

বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস:-

প্রাচীন ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল “প্রাকৃত ভাষা” খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে লিখিত ও কথ্য ভাষা রূপে ভারতের নানা জায়গায় এই প্রাকৃত ভাষা সামগ্রিক ভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের এই কথ্য প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। অবশ্য প্রাচীন ভারতের এই প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে ‘পালি’ ভাষা ছিল অন্যতম খ্রিষ্ট জন্মেরও কমপক্ষে ৬০০ বছর আগে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাসহ গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজি, হিন্দি, ফরাসি, ডাচ, নেপালি ইত্যাদি ভাষা ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক ৫০০০ বছর পূর্বে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল।

বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) প্রাচীন বাংলা (৯৫০ -১৩৫০)খ্রিস্টাব্দ (২)মধ্য বাংলা (১৩৫০-১৮০০) খ্রিস্টাব্দ এবং (৩) আধুনিক বাংলা (১৮০০- খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত)

প্রাচীন বাংলা ভাষা:-

প্রাচীন বাংলা ভাষার ইতিহাস(৯৫০-১৩৫০) এই সময়ে লিখিত নিদর্শনের মধ্যে আছে চর্যাপদ ভক্তিমূলক গান। উড়িয়া ও অসমীয় এই সময়ে বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে এই যুগে এমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের প্রভাব ঘটেনি, এই কারণেই এই যুগকে বাংলা ভাষার ‘অন্ধকারময় যুগ’ (ডার্ক এজ) হিসাবে মান্য করা হয়।

মধ্য বাংলা ভাষা :-

মধ্যবাংলা ভাষা ১৩৫০-১৮০০খ্রিষ্টাব্দতে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ছিল চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’। কোন - কোন ভাষাবিদ এই যুগকে ‘আদি ও অন্ত’ এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। বহুসংস্কৃত গদ্য পদ্য এই সময়ে বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করে বাংলা সাহিত্যকে অনেক অগ্রগতির দিকে পৌঁছে দিয়েছে।এই সময়ে অসংখ্য কাব্য যা দেবদেবীর ঐশ্বরিক শক্তিকে বর্ণন করে তার ভাবধারা অনুবাদিত হয়। ‘বড়ু চন্ডীদাস’ এই সময় জয় দেবের সংস্কৃত কাব্য ‘রাধা কৃষ্ণকে’ বাংলায় অনুবাদ করেন।

আধুনিক বাংলা ভাষা:-

(১৮০০ -বর্তমান পর্যন্ত) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা হয়েছিল। এই সময়ে যখন অসংখ্য গদ্য, পদ্য, ও রচনা কাব্য বিভিন্ন ছন্দে মাধুর্যে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছিল বাংলা ভাষা সাহিত্যকে। ১৮ শতকের প্রথমে ডোম এঁটনিয়র দ্বারা ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’ নামক প্রথম বাংলা বই মুদ্রিত হয়। ‘গ্রামার অফ বেঙ্গল’ ১৭৭৬ সালে লিখিত হয়, ‘ন্যাথেনিওল ব্রাসে হেলবেড’ দ্বারা এবং বইটি প্রকাশ পায় ১৭৭৮ সালে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে এই সময়ে অসংখ্য সাহিত্যিক,উপন্যাসকার, কবি যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভারত তথা বিশ্ব দরবারে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে গেছেন,তাঁরা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) শ্রী প্রমথ চৌধুরী(১৮৬৮-১৯৪৬), শ্রী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়(১৮৭৬-১৯৩৮), শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু, রাজা রামোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ ঘোষ, ইত্যাদি এঁদের রচনা আজও সবার মাঝে অজর অমর চিরভাস্বর হয়ে আছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন বিশ্বকবি উপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীত স্রষ্টা, চিত্রকার, ছোটগল্পকার, অভিনেতা কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।এশিয়া মহাদেশের তিনি প্রথম নোবেল বিজেতা ছিলেন । বাংলা সাহিত্যে আরো যাঁরা আসন পেয়েছেন তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ বসু, শঙ্কর, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী ইত্যাদি।

ভাষা আর মানুষ দু'টি অবিচ্ছেদ্য প্রত্যয়। বাংলা ভাষার স্থান আজ সমস্ত বিশ্বের চতুর্থতম। ১৯৯১ সালে ১৭ ই নভেম্বর 'ইউনেস্কো' বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছে। আজ পৃথিবীর প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। পৃথিবীর তিনটি দেশে আজ বাংলাকে জাতীয় ভাষা বা অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে (বাংলাদেশ, ভারত ও সায়েরা লিওন যেটা সাউথ আফ্রিকায় অবস্থিত)।বলা বাহুল্য যেহেতু বাংলা বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য গুলির একটি যার ইতিহাস বহু শতাব্দী আগে চিহ্নিত হয়েছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রমাণটি ছিল ৮০০-১২০০ শতাব্দীতে। বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক কবিতা পূর্ব ভারত থেকে আসে। চারিপদা বা চারিগিতির কবি ছিলেন সিদ্ধাচার্য। এই গ্রন্থে বাংলা ভাষার লিখিত রূপটি প্রকাশ পায়। ১৯০৭ সালে নেপালের 'ওয়ালকোর্ট' লাইব্রেরীতে বাঙালি ভাষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তালপাতায় লিখিত চর্যাপদের সন্ধান পান।

বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্য গতিশীলতা অর্জন করে। এর পরে বিংশ শতকের শেষভাগে বাংলা কবিতা, নাটক ও সমসাময়িক মিডিয়া সমানভাবে অগ্রগতি অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীতে বাংলার সংযোজন সমসাময়িক সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক, সংস্করণ গুলির বিপ্লব আনে। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যিকের বিখ্যাত নাম গুলির মধ্যে রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, বাণী বসু এবং মতি নন্দী।বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ বিশ্বের এক বিস্ময়কর ইতিহাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ ছাপার অক্ষরে পুস্তক আকারে বন্দি হয়ে আছে ঘরে ঘরে, জাতীয় লাইব্রেরীতে। বন্দি হয়ে আছে গদ্যে-পদ্যে, কাব্যে, ছন্দে, ও উপন্যাসে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ আমাদের মানব জীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ। সময় পরিবর্তনশীল, মানুষ পরিবর্তনশীল, সময় ও কাল পাত্রের সাথে সাথে তাই আধুনিক সময়ে পরিবর্তন এসেছে। দ্রুতগতিতে আর এই পরিবর্তন তাই আর এক নতুন যুগের ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে যাকে আমরা আজ 'ইলেকট্রনিক' সাহিত্য বলে জানি, জানি ডিজিটাল সাহিত্য রূপে।

বাংলা সাহিত্য ও ডিজিটাল করনের ইতিহাস:-

প্রথমেই আমরা 'ই-সাহিত্য' আর ই ডিজিটাইজেশনের ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেছি। যেহেতু আমরা বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি এবার তাহলে আমরা 'ই-সাহিত্যকে' গভীর ভাবে বোঝার চেষ্টা করি, কিভাবে সাহিত্যের জগতে আজ এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই 'ই- সাহিত্য।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক প্রতীক। বাংলা ভাষা তাই প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল। বাংলা অক্ষরে ছাপা খানা বা প্রিন্টিং

প্রেস শুরু হয় ১৭৭৮ সালে। ১৭৮০ সালে প্রথম সংবাদপত্র বাংলায় প্রকাশিত হয় যা 'বেঙ্গল গেজেট' নামে পরিচিত। বাংলা প্রিন্টিং প্রেসের যিনি জনক ছিলেন তার নাম 'চার্লস উইলকিন্স'।১৮০০সালে প্রথমবার বিরাট আকারে ছাপাখানার কাজ শুরু হয় 'ফোর্ট উইলিয়াম' কলেজে। উক্ত কলেজে তখন বাংলা ভাষায় বাংলা বই বের করার জন্য প্রয়োজন বোধ করে। এর পরে ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রথম মাসিক পত্রিকা বের হয় দিকদর্শন নামে। এর পরপরই প্রকাশ পায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্শন'। আজ প্রায় ২০০ বছরের বিভিন্ন গদ্য-পদ্য, কাব্য, রচনা, বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, অথবা বড় বড় সংস্থার লাইব্রেরীতে। অনেক বই যা সংরক্ষণের অভাবে অনেক বিরল সাহিত্য আজ বিলুপ্ত প্রায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই বিশাল সমৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সাহিত্যের এই অগাধ জ্ঞান ভান্ডার যা বিভিন্ন মনুস্ক্রিপ্টে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে বদ্ধ হয়ে আছে তাকে আজ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এসেছে সাহিত্য প্রেমিক মানুষ ও বিভিন্ন নতুন প্রজন্মের মানুষদের। আজ তাই প্রয়োজন এসেছে আধুনিক সময়ের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অথবা ইলেকট্রনিক সফটওয়্যার এর অথবা ডিজিটাল করনের। বৈজ্ঞানিক, গবেষক, তান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাই আজ আমাদের সামনে এক নতুন যুগের আশার আলো এনেছে যাকে আমরা 'ই-সাহিত্য' বা ডিজিটাল সাহিত্য হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হব। ডিজিটাল করনের মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি। বাংলা 'ই-সাহিত্য' সৃষ্টি হলে আমরা এটাকে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে তুলে ধরতে পারব। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে। পারব আমরা ঘরে ঘরে বাংলা সাহিত্যকে অনায়াসে পৌঁছাতে। পারব আমরা আবার বাংলা সাহিত্যকে পুনর্জীবিত করতে যার উপভোক্তা হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের বংশধররা।

ডিজিটাল করন:-

বাংলা ভাষায় 'ই- সাহিত্যের' প্রথম ডিজিটালকরণের কাজ শুরু হয় ২০০৩ থেকে যাদবপুর বিশ্বিদ্যালয়ের অধীনে 'ইনস্টিটিউশন স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট এন্ড রেকর্ডস' এখানে ছাপা বই থেকে ডিজিটাল আকারে আনার সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য বই, মনুস্ক্রীপ্ট,জীর্ণ সাহিত্যকে এখানে নতুন জীবন দান দেয়। বিংশ শতাব্দি থেকে আজ পর্যন্ত যত বাংলা বই, সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশ 'ই- সাহিত্যে' রূপান্তর করা হয়েছে, যার সংখ্যা ৩২৮৬ প্রায় ৭৮টি টাইটেলস যার ১৯০২-১৯৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল তাকে ডিজিটাল করন করে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। এই সংস্থাতে টি আই এফ এফ, জেপিজি, পিডিএফ ফরমেট ফাইল তৈরি করা হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয় বিলুপ্ত প্রাপ্ত সাহিত্যকে যাকে আমরা 'স্ট্রিট লিটারেচার' বলে জানি তাকে ডিজিটাল করন করা হয়েছে। "বিচিত্রা প্রজেক্ট যেটা একটি অনলাইন সংগ্রহ সেখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত লেখাকে ডিজিটাল করন করেছে, যার সংখ্যা ৪৭৫০২০ পাতা এবং মনুস্ক্রিপ্টে পাতা ৯১৬৩৭। এই সংস্থার এই মহান কাজ কে সাধুবাদ জানাই।

সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ সোসাল সাইন্সেস (কলকাতা):-

এই সংস্থাতে ১৮০০-১৯৫০ দশকের জার্নাল ও পুস্তকের ডিজিটাল করন করে একটি 'আর্কাইভ' তৈরি করেছে এখানে মাইক্রো ফিল্মের এক অভূতপূর্ব বিরল সংগ্রহ করে নুতন ইতিহাস রচনা করেছে যাকে হিতেস্বর রঞ্জন সান্যাল মেমোরিয়াল আর্কাইভ নামে পরিচয় প্রদান করেছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতা:-

এই জাতীয় গ্রন্থালয়ে প্রায় ৩২ লাখ পত্র-পত্রিকাকে 'ই- সাহিত্যে' রূপান্তরিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ও ঘটনা যে

১৯১৪ সালের পূর্বে যত সব বাংলা বই, সাহিত্য, পত্রিকা ছাপানো হয়েছিল তার সবগুলোই প্রায় 'ই-সাহিত্যে' বা ডিজিটাল করন করা হয়েছে। আরও সুখবর যে এই সব 'ই- সাহিত্যকে' 'লোকাল সার্ভারে' লোড করা হয়েছে। তাই এই জাতীয় সংগ্রহালয় থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে সাহিত্য রসিকরা উপকৃত হচ্ছে ।

ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া:-

ভারতের এই বৃহত্তম লাইব্রেরীতে প্রায় ৭৮৬৫৫৮৯ পাতা বই 'ই- সাহিত্যে' রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে অনায়াসে ডাউনলোড করা ও অনলাইনে পাবার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বহু সংস্থান রয়েছে যারা বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের নিজ-নিজ সংস্থানের লাইব্রেরীতে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া নিয়মিত ভাবে শুরু করেছে। 'ইন্টারনেট আর্কাইভ' এটা একটি লাভ হীন ডিজিটাল আর্কাইভ যার উদ্দেশ্য জ্ঞান প্রাপ্ত করা ও দান করা। ১৯৯৬ তে এর সূত্রপাত এবং বিশ্বব্যাপী মানুষদের প্রতি উদার হৃদয় হয়ে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছে।

ই-সাহিত্য ও ই কনটেন্ট:-

'ই- সাহিত্যের' পাশাপাশি 'ই-কনটেন্ট এর মহত্বও আমাদের জানা দরকার। ই-কনটেন্ট হলো ডিজিটাল ও ভার্চুয়াল ও অনলাইন কন্টেন্ট নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। ই-কন্টেন্ট যে কোনো ধরনের সামগ্রীকে একত্রিত করে সংরক্ষিত করে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র ও উপকরণের মাধ্যমে দেখতে, শুনতে ও পড়তে, লিখতে, বলতে ও বুঝতে পারা যায়। আমাদের দৈনন্দিন আবশ্যকতা অনুযায়ী পুরানো সাহিত্য সামগ্রী জার্নাল ছাপানো বই আদিকে আধুনিক মাল্টিমিডিয়া দ্বারা, ইলেকট্রনিক সহায়তায় প্রস্তুত করা যায়। ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে দূর থেকে দূরান্তরে, প্রচার ও প্রসারন সংরক্ষণ এবংনিজেদের মতামত প্রকাশ করার পদ্ধতি অনেক সহজ ও সরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ই-কনটেন্টের নেটওয়ার্কিং দ্বারা দূর দুরান্তের সব কিছুকে আমরা বুঝতে শুনতে, দেখতে ও অনুভূতি করতে পারি। সাধারণ ভাবে কম্পিউটার ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, মোবাইল ফোন ও বর্তমানে সুপার কম্পিউটার এর দ্বারা ই-কন্টেন্টকে ব্যবহার করা যায়। আজকাল নেটওয়ার্কিং, ওয়েব ক্যাম, হোয়াইটবোর্ড, স্ক্রীন কাস্টিং, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও বিভিন্ন শিক্ষার প্রশিক্ষণ, অডিও ভিডিও দ্বারা ই-কন্টেন্টকে কাজে লাগানো হয়েছে। শুধু তাই নয় এক দেশ থেকে অন্য দেশের সঙ্গে মিটিং, কনফারেন্স, বিশ্বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার আদান-প্রদানও ই-কনটেন্ট অথবা টেলিকনফারেন্স দ্বারা ভ্রমণ না করে তা অপিসে/ ঘরে বসে অনায়াসে করা যেতে পারে। ই- কনটেন্ট দ্বারা আমরা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে, জল স্থল, পাহাড়-পর্বত, এমন কী দুর্গম হিমশীতল হিমালয়ের সমস্ত কিছু দেখতে শুনতে পারি যা সর্বদা একটা জীবন্ত প্রতীক।

উপসংহার:-বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেমন প্রাচীনকাল থেকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাথে, প্রতিটি শিরা উপশিরার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি ই-সাহিত্য ও ডিজিটাল করন আমাদের বর্তমান জীবনে নতুন স্পন্দন এনে দিয়েছে। ই-সাহিত্য তাই নতুন করে আবার পুরানো দিনকে ধরে রাখার জন্য এক নতুন প্রাণ সৃষ্টি করেছে। আজ তাই আবার নতুন করে ভাবতে হবে যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য অজর,অমর,চিরভাস্বর জীবন্ত হৃদ স্পন্দনের মত , আমাদের সাথে - সাথে চলবে অনন্তকাল ধরে, যুগ-যুগ ধরে। আজ আমাদের সাহিত্যকে আর হারাবার সুযোগ থাকবে না। যেহেতু আমরা ই-সাহিত্যকে ডিজিটাল করণ করতে পেরেছি, পেরেছি আমাদের সাহিত্যকে আমাদের জীবনের চলার পথের এক পাথেয় হিসাবে। এভাবে সাহিত্য ভাষা চলবে, চলতে থাকবে, আমরন কাল ধরে, অনন্তকাল ধরে।

অনুশীলনী

(১) বাংলা ভাষার ইতিহাসকে সাধারনত কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং তার মধ্য থেকে যে কোন দুটি ভাগ সবিস্তারে আলোচনা করো ।

(২) আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যাহা জানো লেখো ।

(৩) বাংলা সাহিত্য ও তার ডিজিটাল করনের ইতিহাস লেখো ।

(৪) বাংলা সাহিত্যকে ডিজিটাল করনের ক্ষেত্রে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' ও 'ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া' এর ভূমিকা কী তাহা লেখো ।

(৫) ই -সাহিত্য ও ই- কনটেন্ট এর বিষয়ে যাহা জানো তাহা লেখো ।

(৬) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাংলা অর্থ লেখ :-

1) Uniformity 2) Judicial service
3) Feeble 4) Inhabitants
5) Compunction 6) Memory
7) Moral courage 8) Excited
9) Minister 10) Member

ব্যাকরণ

বাক্য পরিবর্তন

নিম্নলন্মলিখিত বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন করে পুনরায় লেখ।

১) বুড়ি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে। (প্রশ্ন বোধক বাক্যে)

২) মাতাদীন পেশকার সাহেবের বাড়ি বেশি দূরে নয়। (হ্যাঁ বাচক বাক্যে)

৩)সংসারে তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । (প্রশ্ন বোধক বাক্যে)

৪)সাঁতার জানলে আবার ভয় কীসের। (জটিল বাক্য)

৫) সাহিত্য সম্বন্ধে ও ওইকথা খাটে । (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

৬) ওর ভেতর দিয়ে নাই গেলে । (অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে)

৭) আর কামড়ালেই বা কী করব। (না বাচক বাক্যে)

৮) কেমন পশুবলে জগতের কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই। (হ্যাঁ বাচক বাক্যে)

****

বাংলা ভাষা ও কর্মসংস্থান

আনন্দবর্ধন

আনন্দবর্ধনের জন্ম ১৯৯০ সালের ২৭ এ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা শহরে হয়েছে। ঘরে হিন্দী সাহিত্যক পরিবেশে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিতে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে হিন্দী এবং বাংলা উভয় ভাষায় তিনি অসাধারন দক্ষতা অর্জন করেন। তাই হিন্দী-বাংলা অনুবাদক রূপে কার্য করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী গবেষক ছাত্র রূপে কার্যরত,এছাড়া হিন্দী সাহিত্যিক গীত ও গান যেমন নিরালা,মহাদেবী ,বচ্চন,নিরজ ইত্যাদি তার প্রকাশাধীন রচনা হলো -রবীন্দ্রনাথকী প্রকৃতি চেতনা ।

-:পাঠের মূলকথা:-

বাংলা ভাষাকে সাধু ভাষা, সাহিত্যিক ভাষা ও চলিত ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা শব্দ ভান্ডারে অনেক অন্য ভাষা এবং বিদেশী ভাষার ও শব্দের সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। বাংলা ভাষাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করনের জন্য ব্যবহার এমন কি বাংলা ভাষা কিভাবে আমাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ও সাহায্য করে থাকে তাও বলা হয়েছে।

বাঙালি ভাষা ভারতীয়-

আরিয়ান পরিবারের ভাষা। এটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ কোটিরও বেশি লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এটি বাংলাদেশের রাজ ভাষা ও ভারতের ২২টি ভাষা গুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলা ভাষা অসমীয়াকে বাদ দিলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পূর্বদিকের সবচেয়ে প্রান্তিক ভাষা বাংলা। নব্য ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর এই ভাষা ঐতিহাসিক সূত্রে আইরিশ, ইংরেজি,ফরাসি, গ্রিক, রুশ, ফারসি ইত্যাদি ভাষার দূরবর্তী জ্ঞাতিভগ্নী । পশ্চিমে ওড়িয়া, মাগধী, মৈথিলি এবং পূর্বে অসমীয়া ভাষাত সীমান্ত। এছাড়া সাঁওতালি, মুন্ডারি, খাসি ইত্যাদি অস্ট্রিক গোত্রের ভাষা এবং কাছারি, বোড়ো, গারো, ত্রিপুরী ইত্যাদি ভোট- বর্মী গোত্রের ভাষাও বাংলাকে ঘিরে রেখেছে, কখনও বা তার অঞ্চলে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

ইতিহাস মাগধী প্রাকৃতের (খ্রি.পূ. ৬০০ -খ্রি ৬০০) পরবর্তী স্তর মাগধী অপভ্রংশ এবং তৎপরবর্তী স্তর অবহট্টের মধ্য দিয়ে ৯০০- ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ স্বাধীন নব্যভারতীয় আর্য ভাষা রূপে বাংলার উদ্ভব হয়। এর সঙ্গেই উদ্ভুত হয় পূর্বমাগধীয় আরও দুটি ভাষা ওড়িয়া ও অসমিয়া। তবে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ও অসমীয়ার ভাষাগত পার্থক্য ছিল সামান্য।

বাংলা ভাষার প্রকার:-

বাংলা ভাষাকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যথা:

* সাধু ভাষা (মৃদু বা অভিজাত ভাষা)
* সাহিত্যিক ভাষা যাতে বহু সংস্কৃত শব্দ রয়েছে এবং এটি অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন।
* চলতি ভাষা: শিক্ষিত বাঙালি জনগণ এবং সাধারন জনগন উভয়ই চলমান বা সাধারণ কথোপকথনের জন্য এই চলতি ভাষা ব্যবহার করেন। এটি কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার স্থানীয় কথোপকথনের ভাষার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট যা সময়ের সাথে বিকশিত হয়ে চলেছে।

কয়েকটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব মানা হয়, যেমন ভাক্ষী লিপি (যা মোটামুটি ব্রাক্ষী লিপির পূর্বের স্বরূপ থেকে উদ্ভুত) কিছু কিছু স্থানে দেবনাগরী লিপি থেকে আবার কিছু কিছু জায়গায় উড়িয়া ভাষা গুলির প্রভাব দেখা যায় তবে আমরা এটাও বলতে পারি যে এই ভাষার মধ্যে অসমীয়া লিপির অনেক বেশি মিল দেখা যায়।

উদ্ভবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কে তিনটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে ভাগ করে দেখা হয়: প্রাচীন বাংলা (৯০০/১০০০ - ১৩৫০), মধ্যবাংলা (১৩৫০-১৮০০) এবং আধুনিক বাংলা (১৮০০ - র পরবর্তী)। প্রাচীন বাংলার লিখিত নিদর্শনের মধ্যে চর্যাগীতিকাগুলি সর্ব প্রধান, যদিও এগুলির ওপর অন্যান্য পূর্বমাগধীয় ভাষার দাবি তুচ্ছ করার মতো নয়।বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ বাংলার একটি সুস্পষ্ট আদি স্তর নির্দেশ করে। কারণ মধ্য বাংলার পরবর্তী রূপের সঙ্গে এই বাংলার দূরত্ব কম নয়। পরবর্তী মধ্য বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায় রামায়ণ- মহাভারত- ভাগবতের অনুবাদে, বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিতে, নানা মঙ্গলকাব্যে আরাকান- রোসাঙ্গ অমাত্যসভার মানবিক গাথা সাহিত্যে, শাক্ত পদাবলী এবং পূর্ববঙ্গ- গীতিকায়। এ পর্বে গদ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহার , সংস্কৃত (তৎসম) শব্দাবলীর ঋণ গ্রহন এবং ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের ঋণও বিশেষ লক্ষনীয়। এটা হলো বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক অবস্থান ও ক্রমবিকাশের কথা।এবার আমরা এই ভাষাকে ঘিরে কি ধরনের কর্মসংস্থানের বিকাশ ঘটেছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব:

সামান্য বা সাধারণ বাংলা:

সামান্য ভাবে যদি দেখা যায় বাংলা ভাষা আজকের দিনে সাধারণ থেকে সাধারণতর মানুষেরা নিজের দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার করেন। যেমন রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে যে কোনো বড় শপিং-মল অবধি, বাংলা ভাষার সাধারণ প্রয়োগ আমরা সর্ব সাধারণের মধ্যে দেখতে পাই । যেমন রেলওয়ে স্টেশন এর টিকিট কাউন্টার হোক বা স্টেশন এর ঘোষণা হোক, যদিও স্টেশনে ভারতীয় ভাষা হিসাবে রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ও সরকারি ভাষা ইংরেজিতেও ঘোষণা শোনা যায় এবং যে মানুষেরা বাংলার নন তারাও ওই ঘোষণা গুলির তিনটি রূপ শুনে শুনে অবচেতন ভাবে বাংলা ভাষার রূপ জানতে পারেন। আর যেহেতু প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষার মোটামুটি ব্যাকরণ এক হওয়ায় তা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

সাহিত্যিক বাংলা:

সাহিত্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা ভাষা অন্যতম এক ভারতীয় ভাষা। এই ভাষা খুব মিষ্টি তাই এতে গল্প, কবিতা, নাটক, কাব্যরচনা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার সাহিত্যিক চর্চা এই ভাষার প্রাক কাল থেকেই শোনা যায় যেমন চর্যাপদ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সাহিত্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত, সত্যজিৎ রায়ের রহস্য গল্প প্রভৃতি। এই ভাষায় এত আগে থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছে যে আমরা সঠিক ভাবে কোন গন্ডি টানতে পারি না । এই সাহিত্যিক বাংলা সাধারণ মানুষেরা রেডিও, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ইন্টারনেট প্রভৃতি মাধ্যমে চর্চা করেন।

প্রয়োজন মূলক বাংলা: বিবিধ উদ্দেশ্য-

সাধারণ বাংলা হিসাবে যে কথাগুলি উল্লেখিত হয়েছে সেগুলিতেই আমরা বিবিধ প্রয়োজন মূলক বাংলার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি যেমন সর্বসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বাংলা ভাষা।

প্রয়োজন মূলক বাংলা: বিবিধ রূপ-

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলার বিভিন্ন উপ ভাষার প্রভাব বাংলাভাষীদের মধ্যে থেকেই যায়। নির্দিষ্ট কোন উপভাষী ব্যক্তি ঘরের ভেতরে তার নিজস্ব ভাষা, ঘরের বাইরে সাধারণের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা এবং শিক্ষা বা শিল্প- সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও সুচারুমান বাংলা ভাষা ব্যবহার করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনায় বাংলা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োজন মূলক বাংলা: বহুআয়ামী উপযোগিতা-

বাংলা ভাষার ব্যবহার ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যাপকভাবে করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণভাবে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য,শিল্প, নাটক, গণমাধ্যম ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানসম্মত বাংলাই ব্যবহৃত হয়, তবে স্বল্প পরিমাণে হলেও উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও ইদানিং হচ্ছে।

বিদেশ সম্পর্কিত কাজে বাংলা ভাষা: বাংলাদেশের ও ভারতের পশ্চিম-বঙ্গে সরকারি কাজে প্রধানত বাংলা ব্যবহৃত হলেও বিদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগে, বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত : ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। তবে এখন বিশ্বায়নের সময়ে পৃথিবীর অনেক স্থানে বাংলা সিনেমা, সাহিত্যের প্রসার হয়েছে যার ফলে বাংলা কেবল পশ্চিম-বঙ্গ বা বাংলাদেশেই সীমিত নেই।

বিবিধ সেবা ক্ষেত্র ও বিবিধ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা :

যেহেতু ভারতের সংবিধান ইংরেজি ও হিন্দীতে প্রথম দিকে বিকশিত হয়, পরে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের ভাষা অনুসারে তার ভাষান্তরও ঘটে যা আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখতে পারি এবং বর্তমানে জরুরী বিধি নিয়ম সরকারি দপ্তরে আমরা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত হতে দেখতে পারছি। এই কারণে সাধারণ মানুষ কেবল ইংরেজি ভাষায় নিজেকে সীমিত রাখতে বাধ্য থাকছে না।

টেকনিক্যাল কাজ ও সুরক্ষা সেবায় বাংলা ভাষা:

আজ বিশ্বায়ন এর সময়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক। এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের স্থান তৈরি করছে যার জন্য মানুষ যে কাজ অনেক সময় লাগিয়ে করত সেটা অনেক তাড়াতাড়ি করতে সক্ষম হচ্ছে, সেটা অন্ন-বস্ত্র - বাসস্থানই কেবল নয় বরং ভাব বিনিময়তেও নিজের ছাপ ফেলছে। আজ টেকনিক্যাল কাজে ভাব বিনিময় কোনো বিশেষ ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। যে টেকনিক্যাল কাজ আগে কেবল ইংরেজিতেই আবদ্ধ ছিল সেটা বিজ্ঞান প্রযুক্তির সাহায্যে এতটাই এগিয়েছে যে এখন প্রত্যেকটি টেকনিক্যাল কাজ বাংলাতেও করা যাচ্ছে। যেমন: ইন্টারনেটে কোন বিষয়ে খোঁজ করা, কোনো লেখা UNICODE এর সাহায্যে কম্পিউটারে খুব সহজেই লেখা গ্রামের মানুষ যারা ইংরেজি ভাষায় পটু নন তারাও কম্পিউটার বাংলা ভাষায় চালাতে শিখছেন এবং নতুন নতুন রোজগার কর্মসংস্থান তৈরি করছেন।

আবার সুরক্ষা সেবাতেও আমরা বাংলা ভাষার প্রয়োগে বাংলার সাধারণ মানুষকে সামরিক বাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারছি। এর ফলে যে অঞ্চল গুলিতে বাংলা ভাষার প্রভাব বেশি সেখানকার মানুষ পুলিশের চাকরি বা সিকিউরিটি এর চাকরিতে কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছেন। ভাষা না জানার জন্য কোনো মানুষ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে না।

তথ্য এবং সম্প্রচার কাজে বাংলা ভাষা:

আজকের বিশ্বায়নের সময়ে তথ্য এবং সম্প্রচার মাধ্যম অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যার ফলে কোনো অঞ্চল বা শহর দেশের খবর ইংরেজি, হিন্দী অথবা কোন বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় সীমিত নেই বরং প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষায় আমরা খবরগুলি ভাষান্তরিত রূপে টিভিতে দেখতে ও রেডিওতে শুনতে পাচ্ছি। বাংলা ভাষাতেও আমরা বিভিন্ন অসংখ্য সংবাদ পত্র -পত্রিকা, বাংলা নিউজ চ্যানেল আদি তৈরি হয়েছে যা দেশ- বিদেশের অনেক খবর তথ্য ও সম্প্রচার মাধ্যমে বাংলা ভাষাতেও উপলব্ধ। এই কারণে বাংলার নতুন প্রজন্ম সাংবাদিকতার পথে নিজের কর্মসংস্থান খুঁজে পাচ্ছে এবং এর জন্য বাংলা ভাষার সম্প্রচারও বাড়ছে।

আলোচনা সভা, সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে বাংলা ভাষা:

পশ্চিমবাংলা হোক বা বাংলাদেশের মানুষ হোক না কেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলের মানুষেরাও এই ভাষার প্রাক কাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা, সম্মেলন ও প্রদর্শনী আদি কাজে এগিয়ে থেকেছেন এবং এই কারণে সাহিত্য, সঙ্গীত, ও অন্যান্য শিল্পের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে যা বাংলার মানুষকে বিভিন্ন শিল্পিসুলভ, কর্মসংস্থান যোগাতে সাহায্য করেছে এবং করছে। বাংলা ভাষার বাংলার সংস্কৃতিকে বিশ্ব সমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে হাত অনস্বীকার্য। ভাষা আছে বলেই তার পরিচয় ও সংস্কৃতি দুইই আছে ।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলা ভাষা:

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে দেশের উচ্চ পদে প্রতিবছর মেধাবী প্রার্থীরা আসীন হন যার ফলে বলা যেতে পারে যে এরাই দেশের ভবিষ্যৎকে দিশা নির্দেশ করেন এই পরীক্ষায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব ভারতীয় প্রার্থীরা আসন গ্রহণ করেন। বড় বড় উচ্চপদস্থ এই মানুষেরা যদি ভারতবর্ষের মতো বিবিধ সংস্কৃতি, বিশেষ দেশকে না জানেন তাহলে নীতি নির্ধারক হিসেবে এত বড় দেশ কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দুস্কর হবে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যেমন ইংরেজি দরকার তেমনি হিন্দীর সাথে রীজনাল ভাষা যেমন বাংলা, উড়িয়া, মারাঠি ইত্যাদির জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজন। বাংলা ভাষা সিভিল সার্ভিসের প্রার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা:

বিশ্বায়ন এর সময়ে ভাষান্তরন বা অনুবাদ এর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুবাদ এর কাজে আজকের প্রজন্ম অনেক কর্ম সংস্থান পাচ্ছেন যেমন সরকারি মহকুমায় সরকারি ভাষা ইংরেজি হলেও সেই নিয়ম নীতির ভাষান্তরণের এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে আবার বিভিন্ন দেশের ভাষার সাহিত্যকে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা গুলিতে ভাষান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তাও আজকের তারিখে অনেক বেড়েছে তার মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। আজ তাই কোনো দেশের সাহিত্য সেই দেশের গণ্ডিতে

আবদ্ধ নেই বরং অনুবাদের জন্য বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য, বই বাংলা ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে এবং যা পাওয়া যাচ্ছে না সেটা নতুন প্রজন্ম অনুবাদ করে ফেলছে যা তাদের কর্মসংস্থান যোগাতে সাহায্যও করছে। এখানে আমরা বিভিন্ন বিদেশি চ্যানেল গুলিকেও বাংলা ভাষায় দেখতে পারি। যেমন: ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, কার্টুন নেটওয়ার্ক,প্রভৃতি বিভিন্ন খেলার চ্যানেল, আবার অনেক বিদেশি সিনেমা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করেও অনেক দেখতে ভালবাসছেন এর ফলে অনেকেই অনুবাদের জগতে ভয়েস ওভার বা ডাবিং (voice over and dubbing) এর অন্য রকমের কাজ পাচ্ছেন যা তাদের কর্মসংস্থান জোগাতে সক্ষম হচ্ছে এবং এই ভয়েস ওভার বা ডাবিং এর জগৎ দিনের পর দিন প্রসারিত হয়ে চলেছে যার ফলে অনেক ধরনের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিষয়ক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা:

বিশ্বায়ন এর সময়ে বাংলা ভাষার প্রশিক্ষণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশীয় বিদেশের মানুষেরা ভারতীয় ভাষার জ্ঞান পাওয়ার জন্য এদেশে এসে ভাষা শিখছেন এর জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও তৈরি হচ্ছে এবং মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা এই দিকে নিজেকে অগ্রসর করছে। পশ্চিমবঙ্গেও আজ অনেক ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করে নিজের জীবন যাপন করছেন।

বিবিধ যন্ত্রে ও কার্যালয়ে বাংলা ভাষা:

আজ আধুনিক বিশ্বে ভারতবর্ষ খুব তাড়াতাড়ি বিকশিত হয়ে চলেছে এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে ইংলিশ ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ছড়িয়ে পড়ছে যার মধ্যে বাংলা ভাষাও অন্যতম ভাষা রূপে দেখা দিচ্ছে যেমন আজকাল স্মার্টফোন হলো সব মানুষের কাছে খুবই মূল্যবান এবং অন্যতম বস্তু। যেখানে মানুষ আজকের তারিখে সব ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত। যেমন সিনেমা দেখার থেকে শুরু করে সাহিত্য পড়া বা খাতা হিসেবেও স্মার্ট ফোন ব্যবহার করা ইত্যাদি। অনেকে এই ফোনেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করছেন এর মধ্যে বাংলাও একটি অন্যতম ভাষা। অনেক বাঙালি আজ নিজের স্মার্টফোনে বাংলায় নিজের লেখা লিখছেন ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বা ই-মেল করার জন্য বাংলা ভাষার প্রয়োগ করছেন। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক মহলের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই আজ বিবিধ যন্ত্রে বাংলা ভাষা এত সহজে ঢুকে গেছে যে যেকোনো ভাষায় ভাব বিনিময় সহজ হয়ে উঠছে।কেবল স্মার্টফোনই নয় তার সাথে ডিস সার্ভিস এর সেটপ বক্স, কম্পিউটার, ট্যাবলেট, ইত্যাদিতেও বাংলা ভাষাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে আমরা বাংলা ভাষাতেই বিভিন্ন নবীন প্রজন্মের যন্ত্রে বাংলা ভাষা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ব্যবহার করতে পারছি।

এই ধরনের TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS এর জন্য বিভিন্ন কার্যালয়ের বিভিন্ন কার্যেও ভারতীয় ভাষা বা অন্যতম ভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে এর জন্যই ইংরেজি ভাষার উপরে আমাদের নির্ভরতা অনেক কমেছে ফলে কর্মসংস্থানেরও দিন -দিন বিকাশ ঘটছে।

প্রয়োজন মূলক বাংলা শিক্ষা: সাফল্যের কারক এবং জ্ঞানাত্মককৌশল অর্জন-

উপরোক্ত কথা গুলি দিয়ে আমরা এটা বুঝতে পারি যে প্রয়োজন মূলক বাংলা শিক্ষা আমাদের জীবনে অনেক কর্মসংস্থানের রাস্তা খুলে দিচ্ছে যার ফলে মানুষ অনেক সহজেই সাফল্যের পথ পেয়ে যাচ্ছেন এবং তা

কেবল মানুষের সাফল্য নয় বরং এটা ভাষারও সাফল্য। মানুষ নিজেকে যত বেশি কৌশলী প্রমাণ করবে সে ততটাই সাফল্যের কারক হয়ে উঠবে।

পাঠ্যক্রম ও অধ্যাপন:

তবে এটা না চাইলেও মানতে হবে যে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের পাঠক্রমকে আজকের বিশ্বায়নের এর সময় সাময়িক করে তুলতে হবে নাহলে TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে পুরোপুরি ভাবে সক্ষম হবে না। আমাদের পাঠ্যক্রম ও মানসিকতাকে নমনীয় বানাতে হবে যাতে আমরা নিজের গড়া গণ্ডিতে বন্দি না থেকে যাই। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন অধ্যাপক তাদের অধ্যাপনাকে নমনীয় করে তুলতে পারবেন এবং পরের প্রজন্মকে নতুন ভাবে বিশ্বকে দেখার দৃষ্টি দান করবেন। তাই বলা যায় যে পাঠক্রমের যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন দরকার তেমনি দরকার অধ্যাপনার ইতিবাচক পরিবর্তনেরও।

উপসংহার:

অবশেষে বলা যায় যে, বাংলা ভাষা আজকের সময় কেবল কথোপকথনের ভাষা বা সাহিত্যিক ভাষা রূপেই সীমিত নয় বরং এটি আধুনিক কালের কর্মসংস্থান যোগানকারী একটি ভাষা যা আমাদের নবীন প্রজন্মের জন্য নবীন পথ উন্মোচন করার ক্ষমতা রাখে। এর জন্যে আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকেও উপকারী বাংলা ভাষার উপযোগিতা, তথ্য এবং সম্প্রচার কার্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার, টেকনিক্যাল আজও সুরক্ষা সেবায় বাংলা ভাষার প্রয়োগ, জ্ঞানাত্মক কৌশল অর্জন প্রভৃতি দিক গুলিকে নিয়ে বাংলা ভাষাকে নিয়ে চিন্তার একটি মূল জায়গা অধিগ্রহণ করা উচিত। আমাদের এই দিক গুলি নিয়ে ভাবতে হবে তবেই আমাদের বাংলা ভাষা বা ভারতীয় ভাষা সমূহ আমাদের কর্মসংস্থান যোগান দেওয়ার দিকে অগ্রসর হবে। আজকের জগৎ বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করে এবং এই বহুমুখী প্রতিভাকে বাংলা ভাষার দ্বারা কি ভাবে আমরা বিশ্বায়নের যুগে আরো সুন্দর করে তুলতে পারি, এটাই আমাদের ভাবার বিষয় হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

১) সামান্য বা সাধারণ বাংলা ও সাহিত্যিক বাংলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২) প্রয়োজন মূলক বাংলা ভাষার বিবিধ রূপের পরিচয় দাও।
৩) টেকনিক্যাল কাজ ও সুরক্ষা সেবায় বাংলা ভাষার ভূমিকা কি তা আলোচনা করো।
৪) তথ্য এবং সম্প্রচার কার্যে আর আলোচনা সভা, সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যা জানো লেখ।
৫) অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও কর্মসংস্থান এ বিষয়ে যা জান লেখ।
৬) বিবিধ যন্ত্রে ও কার্যালয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জানো তাহা লেখ।

প্রশ্ন (২) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাংলা অর্থ লেখ।

1) Family 2) Agenda
3) Bio-data 4) Abinitio
5) Accountant 6) Abstract
7) Animation 8) Black-mail
9) Board 10) Data-base

৪. সমাচার লেখন

প্রা. শশী মুরলীধর নিঘোজকর

লেখক পরিচয়:- প্রফেসর শশী মুরলীধর নিঘোজকরের জন্ম ১১ই মে ১৯৫৭ সালে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে হয়েছে। তিনি তাঁর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা সাবিত্রীবাঈ ফুলে, পুনে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রহণ করেছেন। তিনি ৩২ বৎসর পুনের স.প. মহাবিদ্যালয়ে হিন্দী বিষয়ের অধ্যাপন কার্য করেছেন। তিনি গল্প, ব্যঙ্গ, বৈচারিক লেখন এবং অনুবাদ লেখনের কার্য করেন এবং মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষাগত সমিতীর সঙ্গেও জড়িত রয়েছেন। প্রধান কৃতি:- "মধুবালা, "দাস্তান- এ - নৌশাদ, " ম্যায় আওর মেরে পড়াও, ইত্যাদি রচনা।

-:পাঠের মূলকথা:-

পাঠ পরিচয় :- প্রস্তুত পাঠে সংবাদ লেখনের বিভিন্ন প্রকারকে আলোকিত করা হয়েছে। সংবাদ শব্দের পরিভাষা কে বুঝিয়ে মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সহিত সম্বন্ধিত সংবাদ লেখনের স্বরূপ, তার মহত্ব, উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। বর্তমান এবং আগামী দিনে সংবাদ লেখন কার্যে রোজগারের যে অসংখ্য সুযোগ আছে তার প্রতি লেখক আমাদের লক্ষ্য আকর্ষিত করেছেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

বিগত দুই দিন ধরে আমরা বিভিন্ন ব্যবসায়ের তথ্য সংকলন করেছি। এই ব্যবসায়ের স্বরূপ, তাতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ, এই ব্যবসায়ের সীমা ইত্যাদি তথ্যের উপরে সেই ব্যবসায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হাইলাইট করেছেন।

বর্তমান সময়ে এমন আরও একটা ব্যবসা আছে। যাতে আমাদের জন্য রোজগার এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সে ব্যবসা হলো সংবাদ লেখন এবং সংবাদ পঠন।

এ বিষয়ে সবিস্তার তথ্য প্রদান করার জন্য আমাদের কার্যশালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ লেখক শ্রী সন্দীপ দেওধর উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আকাশবাণী, সংবাদপত্র এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলে সংবাদ লেখনের কার্য করেছেন। মাননীয় দেওধর মহাশয় আপনাকে এই কার্যশালায় অনেক অনেক স্বাগত জানাই।

(সমস্ত শিক্ষার্থীরা করতালি দ্বারা তাকে স্বাগত জানায়)

দেওধর : ধন্যবাদ! আপনাদের সবাইকে আমার প্রণাম।

সাক্ষাৎকার কর্তা:দেওধর মহাশয়, প্রথমে আপনি বলুন সংবাদ কাকে বলে এবং এর লেখন এর অর্থ কি?

দেওধর :- দেখুন........ সংবাদের সরল অর্থ হলো হালচাল বলা। এই হালচাল কোনো ঘটনা বা প্রসঙ্গের হতে পারে কিংবা মনের ভাবনাও হতে পারে।

সা. ক :- একে আরও বিস্তারিত রূপে স্পষ্ট করুন।

দেওধর :- পূর্বে আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখতাম। পরিবারে ঘটিত ঘটনা তাদেরকে লিখে জানাতাম। এটাই হলো সংবাদ এবং তার লেখন ।

সা. ক :- এর অর্থ এই হলো যে সংবাদ লেখন বহু পূর্ব হতে চলে এসেছে।

দেওধর :- একদম ঠিক বলেছেন; বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা অন্যান্য রাজাদেরকে যে চিঠি পাঠানো হতো, তাও সংবাদ লেখনেরই উদাহরণ এবং এর জন্য পূর্বে সচিব পদ নির্ধারিত ছিল।এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তি পত্রে সংবাদ লিখতেন।

প্রথম শিক্ষার্থী :- তাহলে কি চিঠিতে কুশল জানানোকে সংবাদ লেখন বলা হয়?

দেওধর :- খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো........আজকে আমরা সংবাদ বলতে যা বুঝি, তা বাস্তবে ইংরেজি শব্দ NEWS থেকে নেওয়া হয়েছে। সংবাদের জন্য নিউজ, খবর, হাল-প্রতিবেদন এমন শব্দেরও ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় শিক্ষার্থী:- তাহলে কি এই সংবাদ লেখা বড়ই কঠিন?

দেওধর :- সংবাদ লেখন কার জন্য করতে হবে, এর জন্য ভাবতে হয়।

তৃতীয় শিক্ষার্থী :- এর অর্থ কী ?

দেওধর :- দেখ....... সংবাদ দুই প্রকারের -
প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকাকে সমাবিষ্ট করা হয় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সংবাদ শোনানো এবং দেখানো হয়।

চতুর্থ শিক্ষার্থী:- স্যার....... এটাকে একটু বিস্তারপূর্বক বলুন।

দেওধর :- সংবাদপত্র এবং পত্র - পত্রিকাতে খবর ছাপা হয়, তাই ইহাকে প্রিন্ট মিডিয়া বলা হয়।কিছু খবর রেডিও এবং টিভির মাধ্যমে শোনানো এবং দেখানো হয়। তাই এই খবরগুলোকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার খবর বলা হয়।

সা. ক :- দেওধর মহাশয়...... আপনি একজন কুশল এবং শ্রেষ্ঠ সংবাদ লেখক, অতএব আপনি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংবাদ লেখনের কলা অথবা প্রযুক্তি সম্বন্ধে অবগত করার জন্য কৃপা করুন।

দেওধর :- সাধারণ ভাষায় সংবাদ লেখার অর্থ হলো “কলশিতে সমুদ্র ভরা”। প্রধান নথিকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ কম শব্দে লেখা- সংবাদ লেখনের প্রথম শর্ত । সংবাদ লেখনে আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবহার করতে নেই । সংবাদ লেখনে সম্প্রেষণ তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক । অর্থাৎ সমস্ত পাঠক সংবাদ যেন বুঝতে পারে।সংবাদ লেখনে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার করা, অপেক্ষিত ‘যেমন ঝড়ে বেশ কিছু গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে’। এর স্থানে ঝড়ে অনেক গাছ পড়ে গেছে।

সা. ক :- সংবাদপত্র এবং রেডিওর খবর লেখনে পার্থক্য কি?

দেওধর :- সংবাদপত্রে ছাপা খবর পাঠকেরা পড়ে ও তারা খবর পড়ে সেই খবরের দৃশ্য

নিজের চোখের সামনে অনুভব করে এই জন্য সংবাদপত্রে সংবাদ লেখনে নির্ভুলতা, আকর্ষণীয়তা, মহত্বপূর্ণ নথি, ভাষার সম্প্রেষনিয়তা এবং ঘটনার জীবন্ত বর্ণন করা আবশ্যক।

সা. ক :- তবে রেডিও সংবাদ লেখন কি করে লিখতে হবে?

দেওধর :- রেডিওতে খবর শোনা হয়। শ্রোতা খবর শুনে খবরের ছবি নিজের চোখের সম্মুখে অনুভব করে। রেডিও সংবাদ লেখনেও এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত যা গ্রামের অশিক্ষিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে শহরের শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে যেন বুঝতে পারে।

প্রথম শিক্ষার্থী:- রেডিওর সংবাদে কার ভূমিকা শ্রেষ্ঠ? সংবাদ লেখকের না সংবাদ পাঠকের?

দেওধর:- রেডিওর সংবাদে সংবাদ পাঠকের ভূমিকা শ্রেষ্ঠ। সংবাদ পাঠকের ভাষার উপরে অসাধারণ প্রভুত্ব থাকা উচিত। উচ্চারণ শুদ্ধ এবং স্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । সংবাদ পাঠকের বলার উপরে সংবাদের পরিণামকারকতা নির্ভর করে।

দ্বিতীয় শিক্ষার্থী:- স্যার.......... দূরদর্শনের সংবাদ চ্যানেলের সংবাদ লিখনের বিষয়ে কিছু বলুন।

দেওধর :- দূরদর্শনের সংবাদ চ্যানেলের সংবাদ লেখন অত্যন্ত সরল এবং জটিলও।

তৃতীয় শিক্ষার্থ:- সরল এবং জটিল! এ কি করে সম্ভব, স্যার?

দেওধর :- দেখ........ টিভির সংবাদ শোনাও হয়, দেখাও হয়। অনেকবার দর্শকের লক্ষ্য সংবাদের দৃশ্যের দিকে বেশি থাকে এবং সংবাদের দিকে কম। এইজন্য দৃশ্যকে অধিকাধিক প্রভাবশালী এবং বাস্তবিক প্রস্তুত করার জন্য সংবাদের দৃশ্য ও পরিণাম কারক হওয়া আবশ্যক এবং এই পরিনামকারকতা সংবাদ লেখনের ক্ষেত্রে খুবই জটিল কাজ।

সা. ক :- তবে সংবাদ লেখনের এই জটিলতাকে কী ভাবে সরল করা যায়?

দেওধর :- টিভির সংবাদ, দৃশ্য- অনুসারে লেখা উচিত। সংবাদের ঘটনা অনুসারে মুখ্য তথ্যকে তুলে ধরা দরকার যার দ্বারা ঘটনার বাস্তবিকতা দর্শকের সামনে আসবে।সংবাদের বাক্যগুলি ছোট - ছোট হওয়া দরকার। দৃশ্যকে রেকর্ডিং করার সময় উদঘোষক ঐ ঘটনার যে বিবরণ প্রস্তুত করে, তাতে স্পষ্ট ও তর্কসংগত লেখন ঐ সংবাদে হওয়া দরকার।

চতুর্থ শিক্ষার্থী:- স্যার....... সংবাদের আর একটি প্রকার আছে, যাহাকে ব্রেকিং নিউজ বলা হয়। এই সংবাদ লেখনের উপর দৃষ্টিপাত করুন।

দেওধর :- দেখ বর্তমান যুগ খুব গতিমান। এই ব্যস্তময় যুগে খুব বড়-সড় সংবাদের বিবরণ পড়া, শোনা এবং দেখার সময় কারও কাছে নেই। এই জন্য ব্রেকিং নিউজ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত এবং শীঘ্র সংবাদের উদয় হয়েছে।

সা.ক. :- তবে কি ব্রেকিং নিউজের লেখন একটা বিশিষ্ট প্রকারের?

দেওধর :- হ্যাঁ....... ব্রেকিং নিউজের লেখনে শুধুমাত্র যে ঘটনা ঘটেছে তা প্রধানরূপে উল্লেখ করা হয়। ঘটনার অনুসারে চিত্তাকর্ষক শব্দের ব্যবহার করা হয় । যথা- “ মর্তের সেরা পুরস্কারে অমর্ত্য সেন।” আজ রাজিব - শুনানি।

সা. ক :- এই একটা নতুন কথা আমাদের সম্মুখে এলো। আমরা এও জেনে নিলাম যে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদের নব- নব রূপ আমাদের সম্মুখে আসছে।

দেওধর :- হ্যাঁ....... এখনতো মোবাইল, নেট, টুইট, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিও সংবাদ প্রসারণ করার সাধন হয়ে উঠেছে।

সা.ক :- এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসছি। আপনি আমাদিগকে সংবাদ লেখনের ক্ষেত্রে রোজগারের কেমন সুযোগ আছে সে সম্বন্ধে বলুন।

দেওধর :- সংবাদ লেখনের ক্ষেত্রে অসংখ্য সুযোগ রয়েছে। সংবাদ পত্র, রেডিও, দূরদর্শন সমাচার চ্যানেল- যেমন মিডিয়াতে সংবাদ লেখনের চাকরি পাওয়া যায়। কোনো একটি ঘটনা, প্রসঙ্গের সাথে যুক্ত খবর লেখা, তার সঠিক সম্পাদন করা এগুলি সংবাদ লেখনের মুখ্য অঙ্গ।

সা.ক .:- সংবাদ লেখনের সাথে, সম্বন্ধিত রোজগার প্রাপ্ত করার জন্য সেই ব্যক্তির মধ্যে কি কি গুন থাকা উচিত?

দেওধর :- সংবাদ লেখন করার জন্য ঘটনাটিকে আকলন করার উত্তম ক্ষমতা, ভাষার উপরে অসাধারণ প্রভুত্ব, সঠিক শব্দ চয়ন করার কৌশল, ভাষার পরিনাম কারকতা, হাতের মুঠোয় পৃথিবী ধারণ করার কৌশল্য এরকম গুন থাকা বাঞ্ছনীয়।

সা. ক :- দেওধর মহাশয়....... আজ আপনি আমাদের কার্যশালায় এসেছেন, সংবাদ লেখনের মতো অসাধারণ কার্যের মহত্ব, উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন,এক্ষেত্রে রোজগারের যে অনেকানেক সুযোগ রয়েছে তাও স্পষ্ট করেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

অনুশীলনী

১) নিউজ সংকলন হতে প্রসারণ পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া বিস্তারিত রূপে লেখো ।

২) আধুনিক যুগের সংবাদের স্বরূপ স্পষ্ট করো।

৩) আকাশবাণী ও টেলিভিশনের রোজগারের সম্ভাবনা কেমন?

৪) সংবাদ প্রসারনের সময় কোন- কোন কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হয়?

৫) সংবাদ লেখনের জটিলতাকে কী ভাবে সরল করা যায়?

৬) সংবাদ লেখনের ক্ষেত্রে রোজগার করার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

পরিশিষ্ট

১) সন্দর্ভ গ্রন্থ

১) ‘দ্বীপান্তরের বন্দিনী’ কবিতটি ‘ফনি = মনসা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২) ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’ - বীরাঙ্গনা কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩) ‘নৈশ অভিযান’ প্রবন্ধটি শ্রীকান্ত উপন্যাস থেকে সংকলিত।

৪) মূল ‘অচলায়তন’ নাটকটি কিঞ্চিত রূপান্তরিত করে সহজে অভিনয়যোগ্য নাটক হিসেবে ‘গুরু’ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে।

রসাস্বাদন

দ্বীপান্তরের বন্দিনী (কবিতা)

কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় কোন পঙক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে তাহা বিশ্লেষণ করো।

শব্দার্থ

খটকা = সন্দেহ, নজর = দৃষ্টি, হানা = খান্নাতল্লাশির বা গ্রেফতারের জন্য আগমন, খুনসুড়ি = রসিকতা করা, অপ্রতিভ = লজ্জিত,গদগদবচন = ভাবের আতিশয্যে, দ্যুতি = প্রভা, পোঁতা = রোপন করা, দুপুররাত = মধ্যরাত, দুর্বিষহ = অসহনীয়,মাত্রাছাড়া = অপরিমিত মাথায়, করা = ব্যতিব্যস্ত করা, মুর্ছিত = মুর্চ্ছাগত, চৈতন্যলোপ, হিত = কল্যান, উপকার,সান্ত্বনা = প্রবোধদান, একান্নবর্তী পরিবার = যৌথ পরিবার, নৌবহর = নৌযানের সারি, খালাসী = জাহাজ বা যানবাহন থেকে পন্যদ্রব্য নামানো ওঠানোর জন্য শ্রমিক, শল্য = কাঁটা,গজ = হাতি, রাজকেতু = রাজপতাকা, ক্ষীন = দুর্বল, অর্ঘ্য = পূজার উপকরন, দুষ্কর = কঠিন, অব্যাহিত = মুক্তি, পতিত = ভ্রষ্ট /স্বধর্মচ্যুত্য, জ্যোতির্ময় = যিনি জ্যোতি দ্বারা সমৃদ্ধ, দিনেমানে=দিনের বেলায়, কলিয়ে গেলে = অঙ্কুর বাহির হইলে,ভাবনা = চিন্তা,চড়া = চর,ষষ্টিসহস্র = ষাটহাজার, তূর্য = যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত ভেরি বা শিঙ্গা,আস্পদ = পাত্র, তাগা = দেবতার নামে বাধা সুতো,সংশয় = আশঙ্কা, কাপুরুষ = ভীরু, অগ্রণী = অগ্রচারী, অভ্যুদয় = উদ্ভব, অভিযান = গমন, গম্ভীর = ধীর, ক্যানেস্ত্রা = টিন, আছন্ন = আবৃত, ঢাকা, অভিমান = প্রিয়জনের ত্রুটির জন্য ক্ষোভ, দংষ্ট্ররেখা = দাঁতের রেখা, আকস্মিক = হঠাৎ, খাড়ি = সমুদ্র সংগমের নিকট নদীর খাল বা শাখা, গন্তব্য = যেখানে যাইতে হইবে,

বাগধারা

লাভের অঙ্কে শূণ্য = ফলাফল একেবারেই লাভজনক না হওয়া

কাঁটা দেওয়া =বাধা সৃষ্টি করা

রসাতলে যাওয়া = অধঃপাতে যাওয়া

পঞ্চমুখ = প্রশংসামুখর হওয়া

দোহাই মানা = নজির দেখানো

মাথা হেঁট করা = লজ্জায় মাথা নত করা

অষ্টরম্ভা=ফাঁকি

অথৈ জলে পড়া = খুব বিপদে পড়া

অকূল পাথার = ভীষণ বিপদ

অন্ধকারে ঢিল মারা =আন্দাজে কাজ করা

অমৃতে অরুচি = দামি জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা

বুক ফাটা = হৃদয়বিদারক

অকালকুষ্মাণ্ড = অকর্মণ্য, অকেজো।

নাছোড়বান্দা = উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মরিয়া হয়ে পিছু লেগে থাকে এমন লোক

পাথর হয়ে যাওয়া = স্তব্ধ হয়ে পড়া

অক্কা পাওয়া = মারা যাওয়া

অগাধ জলের মাছ = সুচতুর ব্যক্তি

অর্ধচন্দ্র = গলা ধাক্কা

অন্ধের যষ্ঠি = একমাত্র অবলম্বন

অন্ধের নড়ি = একমাত্র অবলম্বন

অলংকার

১ কুশল কামনা কর কুসঙ্গ করিয়া

২ কুলায় কাপিছে কাতর কপোত দাদুরি ডাকিছে
সঘনেগুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে
গগনে

৩ দিনের আলো নিভে এলো সূর্যি ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ টুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।

৪ গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা
'আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি মা'

৫ উচ্চ কণ্ঠে উঠিল হাসিয়া
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া

৬ সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে।

৭ নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান-

, রস

কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করে অথবা নাটক, অভিনয় দেখে মনে যে স্থিরতর অপূর্ব ভাবের উদয হয়, সেই স্থায়ী ভাবকে কাব্যরস বলে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, শাস্ত্রমতে কাব্যরস হলো অমৃত।

কাব্যরস দশ প্রকার। যথা: (১) আদি, (২) বীর, (৩) করুণ, (৪) অদ্ভুত, (৫) হাস্য, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস, (৮) রৌদ্র (৯) শান্ত এবং (১০) বাৎসল্য ।

আদিরস : নায়ক-নাযিকার অনুরাগবিষয়ক ভাবকে আদিরস বলে।

বীররস : দয়া, ধর্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রাম বিষয়ে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস।

করুণরস: ইষ্টবিয়োগ বা অপ্রিয়সংযোগে যে শোকসঞ্চার হয় তাকে করুণরস বলে।

অদ্ভুত রস : আশ্চর্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাকে অদ্ভুত রস বলে।

হাস্যরস : বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তা হাস্যরস নামে পরিচিত।

ভয়ানক রস : যা হতে মনে ভয় সৃষ্টি হয়, তাকে ভয়ানক রস বলে।

বীভৎস রস : যা দ্বারা মনে ঘৃণাদায়ক ভাবের উদয় হয়, তাকে বীভৎস রস বলে।

রৌদ্র রস : ক্রোধজনক রসকে রৌদ্ররস বলে।

শান্ত রস : তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যে শান্তভাবের উদয় ও অনুরাগ জন্মায় তাকে শান্ত রস বলে।

বাৎসল্য: অনুকম্পার্হ ব্যক্তির উপর অনুকম্পাকারীর সম্ভ্রমশূন্য রতিভাবকেই বলে বাৎসল্য

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

১	১৯৬৬	-	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	গণদেবতা
২	১৯৭১	-	বিষ্ণু দে	স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যত
৩	১৯৭৬	-	আশাপূর্ণ দেবী	প্রথম প্রতিশ্রুতি
৪	১৯৯৬	-	সুভাষ মুখ্যপাধ্যায়	পদাতিক
৫	১৯৯৬	-	মহাশ্বেতা দেবী	হাজার চুরাশির মা

অ.ক্র.	নাম		উপাধি / উপনাম / ছদ্মনাম
১ .	ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	-	বিদ্যাসাগর
২ .	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	ভানুসিং
৩ .	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	কথাশিল্পী / অনিলাদেবী
৪ .	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	সাহিত্যসম্রাট / কমলাকান্ত
৫ .	কাজী নজরুল ইসলাম	-	বিদ্রোহী কবি / ধুমকেতু
৬ .	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	-	শিশুসাহিত্যিক
৭ .	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	-	নীললোহিত
৮ .	বলাইচাঁদ মুখার্জী	-	বনফুল
৯ .	বিমল ঘোষ	-	মৌমাছি
১০ .	শঙ্খ ঘোষ	-	কুম্ভক
১১.	রাজশেখর বসু	-	পরশুরাম
১২ .	মনীশ ঘটক	-	যুবনাশ্ব
১৩ .	সমরেশ বসু	-	কালকুট
১৪ .	সতেন্দ্রনাথ দত্ত	-	ছন্দের যাদুকর
১৫ .	মুকুন্দরাম	-	কবিকঙ্কন
১৬ .	জসীমউদ্দীন	-	পল্লীকবি
১৭ .	সুকান্ত ভট্টাচার্য	-	কিশোরকবি
১৮ .	প্যারীচাঁদ মিত্র	-	টেঁকচাঁদ ঠাকুর
২০ .	কালীপ্রসন্ন সিং	-	হুতোম পেঁচা

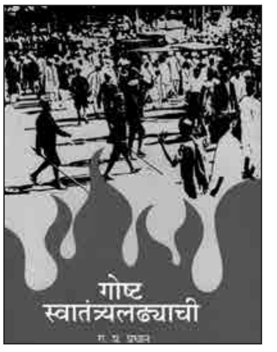

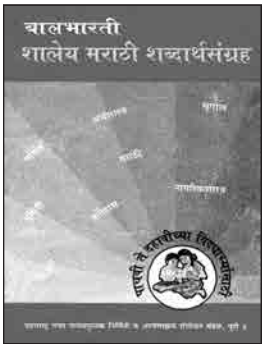

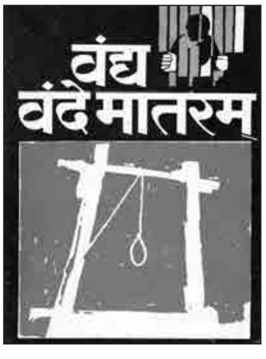

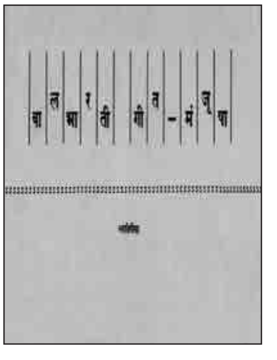

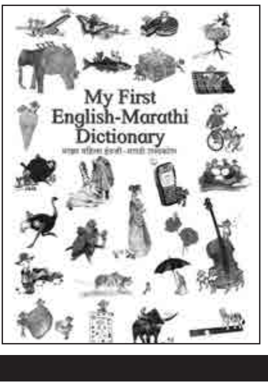

- पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर प्रकाशने.
- नामवंत लेखक, कवी, विचारवंत यांच्या साहित्याचा समावेश.
- शालेय स्तरावर पूरक वाचनासाठी उपयुक्त.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेत स्थळावर भेट द्या.

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

बंगाली युवकभारती इयत्ता अकरावी

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

बंगाली युवकभारती इयत्ता अकरावी

₹ 98.00